স্বপ্ন থেকে এগিয়ে যাওয়া

সফুরউদ্দিন প্রভাত

ছায়াবীথি

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০২৩, আষাঢ় ১৪৩০

প্রকাশক
জাহাঙ্গীর আলম
ছায়াবীথি
১০/২ এ পুরানা পল্টন লাইন, দ্বিতীয় তলা, ঢাকা ১০০০
মোবাইল : ০১৭২৩-৮০৭৫৩৯, ০১৮৭২৭৩৪৫০৫
E-mail : chayabithi2012@gmail.com
Web: www.chhayabithi.com

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সুজন জাহাঙ্গীর

পরিবেশক
আলোর পথযাত্রী পাঠাগার
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৩-৫০৪৪৪১
www.alorpothjatri.com

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/chayabithi
www.chhayabithi.com
http://quickkcart.com
http://boiferry.com/publisher/chayabithi

কম্পিউটার কম্পোজ
এলিয়েন গ্রাফিক্স, ৪৫/১-এ পুরানা পল্টন, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
ক্রিয়েটিভ প্রিন্টিং
৮৬ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২৩০.০০ টাকা

SHOPNO THEKE EGIYE JAOUA by Safuruddin Pravat
Published by Jahangir Alam, Chhayabithi, 10/2 Purana Paltan Line, 1st Floor, Dhaka 1000

Local Price in BDT : 230.00 Only
Intl. Price in USD : $ 11.00 Only

ISBN : 978-984-97782-0-2

উৎসর্গ

বীর মুক্তিযোদ্ধা বাছেত খান

পরিচালক (ইন্টারনাল অডিট), বারডেম জেনারেল হাসপাতাল

সাবেক মহাপরিচালক, অডিট ডিপার্টমেন্ট

সাবেক পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

কবি ও কথাসাহিত্যিক।

ভূমিকা

সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। তবে কোনো মানুষই শ্রেষ্ঠ হয়ে জন্ম নেয় না। মানুষকে মহৎ কর্ম ও সেবাধর্মের ভেতর দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হয়। সফুরউদ্দিন প্রভাতের কর্ম ও চেষ্টা সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। তিনি একজন শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যের সাধক ও সমাজসেবক। তাঁর গড়ে তোলা আলোর পথযাত্রী পাঠাগার ও চিকিৎসালয় এ অঞ্চলের মানুষের আলোকিত জীবনের দিশারি হিসেবে কাজ করবে। এসব কাজে তাঁর প্রেরণা হিসেবে প্রথমে যাঁর নাম বলেন, নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও স্বনির্ভর আড়াইহাজারের রূপকার আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু। তারপর দুঃসময়ের সারথি হিসেবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যাঁর কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ করেন, তিনি অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা বাছেত খান। এক্ষেত্রে তাঁর আরো প্রিয় মানুষ খ্যাতিমান চলচ্চিত্র ইতিহাস গবেষক ও কথাসাহিত্যিক অনুপম হায়াৎ ও কথাসাহিত্যিক ফজলুল কাশেম। তাঁদের প্রেরণাই তাঁর এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়।

সফুরউদ্দিন প্রভাতের সম্পাদনাসহ একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে 'ছায়াবীথি' থেকে একুশের বইমেলা ২০২৩ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'শূন্যতা পূরণ হবার নয়' উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের বিচিত্র বিষয় নিয়ে বইটির অবয়ব। এবারের বইটির নাম 'স্বপ্ন থেকে এগিয়ে যাওয়া'। এতেও আছে রকমারি স্বাদের বিষয়।

'স্বপ্ন থেকে এগিয়ে যাওয়া' গ্রন্থের অবয়ব গড়ে উঠেছে একগুচ্ছ কবিতা, একাধিক প্রবন্ধ ও একটি ছোটগল্প নিয়ে। প্রবন্ধগুলোর নাম : 'স্মার্ট বাংলাদেশ', 'স্মার্ট বাংলাদেশ ও শেখ হাসিনার অভিযাত্রা', 'স্মার্ট লাইব্রেরি ও আলোর পথযাত্রী পাঠাগার', 'রিপোর্টারের ডায়েরি'। প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম থেকে বোঝা যায়, এগুলোতে নতুনত্ব আছে, তথ্যের সমাহার

আছে। এছাড়া দৈনিক সমকালসহ বিভিন্ন অনলাইনে প্রকাশিত সফুরউদ্দিন প্রভাতের বিশেষ প্রতিবেদন 'মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ', 'একজন ডাক্তার সায়মা' ও 'স্বপ্ন যখন আকাশছোঁয়া' এ গ্রন্থে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এক্ষেত্রে সফুরউদ্দিন প্রভাত তাঁর সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। এ গ্রন্থের একমাত্র ছোটগল্প 'অভিমান'। এতে ছোটগল্পের নির্ধারিত আকর্ষণ যেমন আছে, তেমনি আছে অভিমানী রোমান্টিক মনের আকর্ষণ।

'স্বপ্ন থেকে এগিয়ে যাওয়া' গ্রন্থে আছে একগুচ্ছ কবিতা। কবিতাগুলোর নাম; একুশে ফেব্রুয়ারি, শুভ জন্মদিন, স্বাধীনতা, এলো খুশির ঈদ, স্মার্ট বাংলাদেশ, বই পড়ি, অভিমানের বাঁধন টুটে, বৈশাখ, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ, কেমন আছো? স্বপ্নিল বিভোরতা, একটু ঘুমাতে চাই, স্বপ্ন, প্রভু আমায় ক্ষমা কর। কবিতাগুলোর নাম থেকেই তার মর্মকথা কিছুটা অনুভব করা যায়।

কবিতা হচ্ছে গভীর ভাবের বিষয়। কবি যা দেখেন, যা ভাবেন, সেই অনুভূতি ভাষার অলংকারে সাজিয়ে প্রকাশ করেন কবিতায়। সাধারণ মানুষ কখনো কবির মতো দেখেন না, ভাবেন না। সাধারণ মানুষ কোনো বিষয়ের বাইরের সৌন্দর্য দেখেই মুগ্ধ হন, আর কবি তার ভেতরের সৌন্দর্য খুঁজে এনে বাইরের সাথে মিশিয়ে তাকে দ্বিগুণ করে তোলেন। এখানেই কবি আর সাধারণ মানুষের পার্থক্য। সফুরউদ্দিন প্রভাতের কবিতাগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি হলে কথাগুলো যথার্থ মনে হবে।

'স্বপ্ন থেকে এগিয়ে যাওয়া' নামকরণে অবদান রেখেছেন বাংলাদেশ বেতারের খ্যাতিমান গীতিকার ও পটুয়াখালী সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (বাদল)। সবকিছু মিলিয়ে গ্রন্থখানি স্বাদবৈচিত্র্যে আমাদের নিরানন্দ মনে আনন্দ বিলিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন বাবুল

সূ চি প ত্র

স্মার্ট বাংলাদেশ ● ৯
স্মার্ট বাংলাদেশ : বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও শেখ হাসিনার অভিযাত্রা ● ১৭
স্মার্ট লাইব্রেরি ও আলোর পথযাত্রী পাঠাগার ● ২২
সফলতায় : আত্মবিশ্বাস আর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ● ২৫
রিপোর্টারের ডায়েরী ● ৩০
মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ● ৩৩
একজন ডাক্তার সায়মা ● ৩৬
স্বপ্ন যখন আকাশছোঁয়া ● ৪০
একুশে ফেব্রুয়ারি ● ৪২
শুভ জন্মদিন ● ৪৩
স্বাধীনতা ● ৪৪
এলো খুশির ঈদ ● ৪৫
স্মার্ট বাংলাদেশ ● ৪৬
বই পড়ি ● ৪৮
অভিমানের বাঁধন টুটে ● ৪৯
বৈশাখ ● ৫০
দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ● ৫২
নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ ● ৫৩
কেমন আছো? ● ৫৪
স্বপ্নিল বিভোরতা ● ৫৫
একটু ঘুমাতে চাই! ● ৫৬
স্বপ্ন ● ৫৭
ক্ষমা কর প্রভু ● ৫৮
অভিমান ● ৫৯

স্মার্ট বাংলাদেশ

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমরা আগামী ৪১' সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব। আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা চলে যাব।' প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের পর থেকে আইসিটি বিশেষজ্ঞরা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' নিয়ে মত বিশ্লেষণ শুরু করছেন। কারণ ডিজিটাল বাংলাদেশকে ভিত্তি করে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হবে। যেখানে যেকোনো ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সুবিধা গ্রহণ করবে। শহর-নগর-গ্রাম এর সুবিধা গ্রহণে কোনো ব্যবধান থাকবেনা।

What is Smart Bangladesh really?

'স্মার্ট' একটি ইংরেজি শব্দ। ইংরেজি অভিধানে স্মার্ট শব্দটির এক অর্থ হচ্ছে, উজ্জ্বল, নবীন দর্শন, পরিচ্ছন্ন ও সুবেশধারী। আর অন্য অর্থ-চটপটে, তীক্ষ্মধী বা বুদ্ধিমান। চটপটে মানে অযথা চঞ্চলতা নয়, নয় অকারণ বাচালতা। বুদ্ধি, মেধা বা ধীশক্তিও তাই। পঠন-পাঠন ও চর্চার মধ্য দিয়ে নিজের জ্ঞান ও মননকে শাণিত করে তুললে স্মার্টনেস বাড়ে। চিন্তাভাবনা আর দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হয়। তখন যেকোনো বিষয়ে গুছিয়ে কথা বলা যায়, ভাবা যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আত্মবিশ্বাসই হলো আসল স্মার্টনেস। আত্মবিশ্বাস এমনই এক দ্যুতি, যার প্রভাব একজন মানুষের পুরো আচরণে প্রতিফলিত হয়।

কেউ কেউ বলেন, স্মার্ট মানুষেরা সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকেন কিংবা সময়কে এগিয়ে নিয়ে যান।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি সবসময় নিজেকে স্মার্ট হিসেবে জাহির করতেন। আর স্মার্টনেস নিয়ে তিনি সবার সাথে বড়াই করতেন। একদিন তার গ্রামের এক বৃদ্ধের সাথে দেখা করে তিনি গর্ব করে বলেন, "আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ। আমার বুদ্ধিমত্তার সাথে কেউ মিলতে পারে না।"

বৃদ্ধ বললেন, "সত্যি? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রমাণ কর। পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী জিনিস কি?"

লোকটি অনায়াসে উত্তর দিল, "সোনা।"

বৃদ্ধ মুচকি হেসে বললেন, "ভুল। পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী জিনিস হলো অজ্ঞতা। এটি মনকে ভারাক্রান্ত করে এবং উন্নতিকে আটকে রাখে। অন্যদিকে স্মার্টনেস, পালকের মতো হালকা এবং আমাদের উচ্চতায় নিয়ে যায়।"

লোকটি নম্র ছিল এবং সেই দিন থেকে, সে জ্ঞানী এবং নম্র হওয়ার দিকে আরও মনোনিবেশ করতে থাকলো।

আমরা সবাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চিন্তায় মুগ্ধ। কিন্তু তা করার জন্য, আমাদের পুরো ধারণাটির গভীর অর্থ বুঝতে হবে।

এ কথা সত্যি যে স্মার্ট বাংলাদেশের অর্থ এই নয় যে স্মার্টফোন হাতে স্মার্টলি ঘুরে বেড়ানো বা সব সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যা খুশি তাই মন্তব্য করা, স্মার্ট বাংলাদেশ হবে এমন এক বাংলাদেশ, যেখানে মানুষ দেশের যে অঞ্চলেই বসবাস করুক না কেন, সে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সমতার ভিত্তিতে পেতে পারবে, তখন শহর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে জীবনযাপন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য থাকবে না, ঢাকা শহরের নাগরিক যেমন ঘরে বসেই সব কিছু করতে পারবে, তেমনি প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও তাই করতে পারবে। যেমন– প্রত্যন্ত গ্রামের একজন নাগরিককে তার পাসপোর্ট নবায়নের জন্য কোনো অবস্থায়ই অন্য কারো দ্বারস্থ হতে হবে না, সে তার গ্রামে বসেই আবেদন করবে, যা প্রযুক্তির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে আবেদনকারীর নতুন পাসপোর্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে তার কাছে পৌঁছে যাবে, এখানে ডাক বিভাগের ডেলিভারিম্যান ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির ভূমিকা রাখার প্রয়োজন

হবে না, তেমনি আয়কর রিটার্ন দাখিলব্যবস্থা এমন হবে যে মানুষ তার এলাকায় বসে নিজেই রিটার্ন জমা দেবে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যায়িত হয়ে প্রযুক্তির মাধ্যমেই অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ করদাতার কাছে পৌঁছে যাবে, আয়কর কর্মকর্তার তেমন কোনো ভূমিকার প্রয়োজন এখানে হবে না, তাঁরা অবশ্য স্পষ্টই বুঝতে পারবেন যে কারা আয়কর রিটার্ন জমা দেয়নি, বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশেও গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কেউ চাইলেও কোনো বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না, কারণ আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা একেবারে শুরুতেই আটকে যায়, কিন্তু সত্যিকার স্মার্ট বাংলাদেশে খুব সহজেই এটি সম্ভব হবে, যেমনটা উন্নত বিশ্বে হয়ে থাকে, কেননা এসব দেশ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

"স্মার্ট বাংলাদেশ আসলে কি?" এটুআই'র পলিসি অ্যাডভাইজার জনাব অনির চৌধুরী এ সম্পর্কে তাঁর প্রকাশিত নিবন্ধে বেশ কিছু ধারনা দিয়েছেন। তাঁর নিবন্ধে উল্লেখ করেন–

A "smart nation" is defined as "harnessing emerging technologies, networks, and data to create tech-enabled solutions that contribute to nation-building."

("স্মার্ট জাতি" বলতে "উদীয়মান প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক এবং ডেটা ব্যবহার করে প্রযুক্তি-সক্ষম সমাধান তৈরি করা যা জাতি গঠনে অবদান রাখে"।)

১২ ডিসেম্বর, ২০২২-এ সদ্য ঘোষিত স্বপ্ন - স্মার্ট বাংলাদেশ - এছাড়াও ১৬ ডিসেম্বর, ২০৪১-এ এটি বাস্তবে পরিণত হবে সুতরাং, আনুষ্ঠানিকভাবে, আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশের যুগে আছি।

বিগ পিকচারে উত্তর হল স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ কে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হবে। যেমন-

১. উচ্চ-আয়: মাথাপিছু জিডিপি কমপক্ষে ৳১২,৫০০।
২. দারিদ্র্যমুক্ত: ০% চরম দারিদ্র্য এবং ৩% এর নিচে নামিয়ে আনা।
৩. সামষ্টিক অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল: নিম্ন মুদ্রাস্ফীতি (৪-৫%), কম ঘাটতি (জিডিপির ৫%), বিনিয়োগ বৃদ্ধি (জিডিপির ৪০%), এবং কর রাজস্ব বৃদ্ধি (জিডিপির ২০%)।

৪. উচ্চমানব উন্নয়ন: আমাদের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের সর্বোত্তম ব্যবহার করার সময় ডিজিটাল সাক্ষরতাসহ ১০০% উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং প্রত্যেকের জন্য ১০০% স্বাস্থ্য অর্থায়ন।
৫. টেকসই নগরায়ন: ১০০% বিদ্যুতায়নসহ ৮০% শহুরে দেশ, অধিকাংশই নবায়নযোগ্য উৎস থেকে।
৬. নখদর্পণে পরিসেবা: ১০০% পাবলিক সার্ভিস পেপারলেস এবং ক্যাশলেস, এবং ১০০% নাগরিকের নখদর্পণে তাদের ইচ্ছামত।

সবচেয়ে বড় কথা, স্মার্ট বাংলাদেশ মানেই একটি ন্যায়সংগত জাতি-সম অধিকার, সমান সুযোগ, যেখানে কোনো প্রান্তিক গোষ্ঠী থাকবে না।

স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি মূল স্তম্ভ - স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি - ব্যাখ্যা করার জন্য জনাব অনির চৌধুরী ২০৪১ সাল থেকে ৪ জন বাংলাদেশীর ছদ্ম নাম ব্যবহার করে গল্প বলার চেষ্টা করেছেন।

স্মার্ট নাগরিক : আমিই সমাধান

শর্বণী দত্ত বরিশালের একজন ১৮ বছর বয়সী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। স্কুলে যাওয়ার পথে, তাকে একটি বৈদ্যুতিক, স্ব-চালিত স্কুল বাসে তুলে নেয়া হয়, যা স্থানীয় স্মার্ট সেন্টারের দেয়া একটি রুট ব্যবহার করে। ওই রুটে নতুন উড়ন্ত গাড়ি টার্মিনাল নির্মাণের কারণে ওই রুটটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শর্বণী নিজেই একটি সমাধান খোঁজে বের করে। তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে শিক্ষার্থীদের পিকআপ অবস্থানের জন্য বিভিন্ন স্থানাঙ্ক স্থাপন করে বাসের রুট পরিবর্তন করার জন্য কাজ করেন, যার ফলে বাসের রুট গড়ে ১২ মিনিট সময় অপচয় ও ভোগান্তি থেকে রক্ষা হয়। এটাই স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট তরুণরা। প্রতিটি নাগরিককে ইতিবাচক পরিবর্তন করতে এবং জাতি গঠনে অবদান রাখার ক্ষমতা দেয়া হয়। তারা আর "ক্ষমতায়" থাকা লোকদের কাছ থেকে সমাধান খুঁজবে না, সেটা সরকারি বা বেসরকারি যে সেক্টরেই হোক। বরং শর্বণীর মতোই তারাই প্রথম সমাধান খোঁজে বের করতে সক্ষম হবে।

স্মার্ট সরকার : দ্য গভপ্রেনিউর

গভপ্রেনিউর হলেন একজন উদ্যোক্তা, যিনি একটি প্রকল্প তৈরি করেন এবং এটিকে সরকারি পরিবেশে সমস্ত প্রত্যাশিত নিয়ম-কানুন এবং মানসিকতার সাথে ঘটান। এটির জন্য উদ্যোক্তা বা স্টার্টআপ বিশ্বে প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণাবলির প্রয়োজন। একজন গভপ্রেনিউর তার ধারণাগুলোকে রূপ দিতে, সফল করতে এবং জনসাধারণের কাছে মূল্য প্রদান করতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ঝুঁকি এবং প্রতিযোগিতা গ্রহণ করেন। যেমন- বাংলাদেশ সফলভাবে তার মাতৃমৃত্যুর হার ২০৩০ সালে প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে পৌঁছেছে। কিন্তু প্রতি ১০০,০০০-এ মাতৃমৃত্যুর হার ৫০-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য এখনও এগিয়ে যাচ্ছে। তদুপরি, একটি অদ্ভুত অসুস্থতা রয়েছে যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষত গর্ভবতী মহিলাদের প্রভাবিত করে।

আতঙ্কিত নন টাঙ্গাইলের ডিসি সাহেরা বানু। তিনি একটি কর্মজীবন গড়ে তুলেছেন যে কেউ পরীক্ষা করতে ভয় পায় না এবং গণনা করা ঝুঁকি নিয়ে সাহসী পদক্ষেপ নেয়– অনেকটা একজন উদ্যোক্তার মতো। তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় AI এবং ইন্টারনেট অব থিংস (IOT) কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সাথে সংযুক্ত করেন। একটি উপযুক্ত ডিজাইন চিন্তা পদ্ধতির মাধ্যমে, উচ্চ-ঝুঁকির গর্ভধারণগুলিকে দ্রুত শনাক্ত করা হয় কম খরচে, কম-পাওয়ার, ১০ জি-সক্ষম পরিধানযোগ্য স্বাস্থ্য ব্যান্ড যা একটি 3D ড্যাশবোর্ডে ক্লিনিকগুলিতে রিয়েল-টাইমে গুরুত্বপূর্ণ ডায়াগনস্টিক তথ্য প্রেরণ করে। কয়েক দিনের মধ্যে, নির্বাচিত কোম্পানিগুলি তাদের সমাধানকে সরকারের অন্তর্ভুক্ত ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন আর্কিটেকচারে একীভূত করে, গর্ভবতী মহিলাদের জন্য গোপনীয়তা সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকা মহিলাদের জন্য ইউএইচএফপিও-এর হস্তক্ষেপকে পুনরায় অগ্রাধিকার দেয়. মূল্যবান জীবন বাঁচায়।

সাহেরা বানু যাকে আমরা গভর্নপ্রেনিউর বলি; একজন সরকারী কর্মকর্তা থাকাকালীন, তার উদ্যোক্তা স্থান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার স্বাধীনতা রয়েছে এবং তিনি পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের সুবিধাদাতা হতে পারেন যা নাগরিকদের জন্য কেবল সমাধানই নয়, শেষ পর্যন্ত সরকারের প্রতি আস্থা রাখে।

স্মার্ট সোসাইটি : কাউকে পিছনে রাখবেন না

রুমা চাকমা একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তিনি বান্দরবানের মধ্যবয়সী বিধবা। ডিজিটাল মুদ্রা পরিসেবার জন্য ধন্যবাদ, তিনি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী উদ্যোগের মাধ্যমে বাড়তি ভাতা পান।

তার একটি সক্রিয় সামাজিক বৃত্তও রয়েছে যার সাথে সে দেখা করে এবং পারস্পরিক স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করে। তিনি মুদি জন্য কেনাকাটা করতে যান এবং ড্রোনের সাহায্যে তাদের বাড়িতে অর্ডার দেন। তিনি গল্পগুলি উপভোগ করেন এবং বিডিভার্সে তার প্রিয় হুমায়ুন আহমেদ চরিত্রগুলির সাথে যোগাযোগ করেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ছিল নাগরিককেন্দ্রিক হওয়া। স্মার্ট বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাচ্ছে সরকার সম্পূর্ণভাবে জনগণের পক্ষে এবং জনগণের দ্বারা। সমস্ত মানুষ, রুমা চাকমার মতো নাগরিকরা সমাজের একজন সক্রিয় সদস্য, ঠিক আপনার এবং আমার মতো। তিনি একটি দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করেন, এবং আপনি এবং আমি যা করতে পারি তা করতে সক্ষম।

এই পরিবর্তনটি হবে যাকে আমরা an ultimate demand side response (একটি চূড়ান্ত চাহিদা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া) বলি। "কাউকে পিছনে রাখবেন না" বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, অভাবগ্রস্তদের-প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক, সংখ্যালঘুদের ত্রাণ প্রদান করছে না। এটি তাদের এমন একটি জীবন দিয়ে ক্ষমতায়িত করছে যেখানে তারা আর এমনভাবে পরিচয় প্রদান করে না। এটি এমন একটি সমাজ যেখানে সহনশীলতার প্রয়োজন নেই, কারণ সবাই সত্যিই সমান।

স্মার্ট ইকোনমি : আমার গ্রাম আমার শহর

কাজিরা বেগম মৌলভীবাজারে একটি ছোট কাপড়ের দোকান চালান এবং আরও চারজন মহিলাকে চাকরি দেন। প্রতিদিন, সে ঝুঁকি নেয়, সিদ্ধান্ত নেয়, হুমকি প্রতিহত করে, তার ব্যবসা নিরীক্ষণ করে। তিনি তার সন্তানদের, তার বৃদ্ধ বাবা-মা, তার কর্মচারী এবং তার সম্প্রদায়কে সহায়তা প্রদান করেন।

তিনি যা করেন তা হল কপি লিখতে এবং বিজ্ঞাপন পোস্ট করতে AI (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ব্যবহার করে। তিনি তার তালিকা গণনা করতে এবং তার স্থানীয় উপভাষায় তার অ্যাকাউন্টিং করতে ভয়েস-সহায়তা সফ্টওয়্যার ব্যবহার করেন। তিনি তার কাপড়ের আনুষাঙ্গিক মুদ্রণ করতে তার স্থানীয় স্মার্ট সেন্টারে 3D প্রিন্টিং সুবিধা ব্যবহার করেন। গ্রাহকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তার ওয়েবসাইট একটি AI সমর্থিত ভয়েস-বট ব্যবহার করে, যেটি নিজের মতো এক মিলিয়ন CMSME শেয়ার করেছে, স্মার্ট SME ফাউন্ডেশন দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে।

যদি একটি স্মার্ট সোসাইটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ হয় যা কাউকে পিছনে ফেলে না, তাহলে একটি স্মার্ট অর্থনীতি ব্যবসার ক্ষেত্রেও একই কাজ করে। কাজিরা বেগমের মতো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বড় শহরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা থেকে আর বঞ্চিত নন। সবুজ চারণভূমি খোঁজার জন্য তার গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। একটি ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য তার যা কিছু প্রয়োজন তা নাগালের মধ্যে রয়েছে।

বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশগুলোর উত্তম পদক্ষেপগুলো যাচাই করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ : আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১' তৈরি করা হয়েছে যার মূল কথা হচ্ছে, আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংসের (IOT), রোবটিকস, ব্লকচেইন, ন্যানো টেকনোলজি, থ্রি-ডি প্রিন্টিংয়ের মতো আধুনিক ও নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাণিজ্য, পরিবহন, পরিবেশ, শক্তি ও সম্পদ, অবকাঠামো, অর্থনীতি, বাণিজ্য, গভর্ন্যান্স, আর্থিক লেনদেন, সাপ্লাই চেইন, নিরাপত্তা, এন্ট্রাপ্রেনিয়রশিপ, কমিউনিটিসহ নানা খাত অধিকতর দক্ষতার দ্বারা পরিচালনা করা হবে। এই আইসিটি মাস্টারপ্ল্যানে মোট ৪০টি মেগাপ্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে যেসব কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম লক্ষ্য ২০৪১ সাল নাগাদ জাতীয় অর্থনীতিতে আইসিটি খাতের অবদান অন্তত ২০ শতাংশ নিশ্চিত করা। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবও স্মার্ট বাংলাদেশবান্ধব পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল গ্রহণে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোকে স্মার্ট বাংলাদেশের উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করা হচ্ছে।

'ভবিষ্যৎ স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদ্ভাবনী'। অর্থাৎ সব কাজই হবে স্মার্ট। যেমন স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট সংযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিমের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় সব ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত করা হবে। ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নাম পরিবর্তন করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠন করেছে সরকার। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছিল তাতে বলা হয়েছিল, ২০২১ সালের লক্ষ্য 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। ইতোমধ্যে 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন হয়েছে। এবার উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে সরকার। আসুন সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ি। শেষটা কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে–

"আমরা এগিয়ে যাবো, এ আমাদের বিশ্বাস।
বিশ্বের বুকে মাথা করিব উঁচু, ছাড়িব মুক্তির নিশ্বাস।"

তথ্যসূত্র :

- What is Smart Bangladesh really? by Anir Chowdhury, The Confluence, Published:: 12 March 2023
- স্মার্ট বাংলাদেশ : আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১, দৈনিক ইত্তেফাক। প্রকাশ : ২৩-০২-২০২৩
- উইকিপিডিয়া।

স্মার্ট বাংলাদেশ : বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও শেখ হাসিনার অভিযাত্রা

বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব আমরা সবাই অনুধাবন করতে পেরেছি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে তথ্য আদান প্রদান হচ্ছে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। অফিসের কাজ, ব্যবসা, লেনদেন, কৃষি, চিকিৎসা, শিক্ষা ক্ষেত্রসহ প্রাত্যহিক জীবনের বহু কাজ কত দ্রুত আর সহজেই হয়ে যাচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে। আমরা এখন এতটাই তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছি যে, একটা দিনও আমরা তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া চলতে পারি না। আমরা এখন যা বুঝতে পারছি, বঙ্গবন্ধু তা অনুধাবন করেছিলেন বহু বছর আগেই।

১৯৭১ সালের সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ। চাই অবকাঠামোগত পুনর্নির্মাণ, জনগণের কর্মসংস্থান, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সরকার প্রধান হলেন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে আধুনিক ও উন্নত বিশ্বের একটি দেশে পরিণত করা। তিনি জানতেন যেভাবে পৃথিবী পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নতুন নতুন তথ্য-প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে, বাংলাদেশকেও সমান তালে এগিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি সদ্যঃস্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে দূরদর্শী চিন্তা থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণের অসাধারণ যাত্রা শুরু করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, বঙ্গবন্ধু এমন একটা সময়ে এসব কার্যক্রম গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন শুরু করেন যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ টিকে থাকবে কি না এ নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অস্টিন রবিনসনের 'ইকোনমিক প্রসপেক্টস অব বাংলাদেশ' গ্রন্থে (১৯৭৩ সালে প্রকাশিত) বাংলাদেশের ভবিষ্যত ম্যালথাসিয়ান স্ট্যাগনেশনের সঙ্গে তুলনা করে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর কঠিন

পরিণতি বরণের পূর্বাভাস প্রদান করেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের বাংলাদেশকে 'Bottomless Basket' (তলাবিহীন ঝুঁড়ি) বলতেও দ্বিধা করেনি। তেমনি এক পরিস্থিতিতে মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনরায় বিনির্মাণের জন্য কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ সকল খাতে পরিকল্পিত উদ্যোগ ও কার্যক্রম তিনি গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে যখন স্বাধীন হয় তখন বিশ্বে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের যুগ চলছিল। বঙ্গবন্ধু এই শিল্প বিপ্লবের যুগে পিছিয়ে থাকতে চাননি। সেজন্যই দেশের মানুষ যাতে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে International Telecommunication Union (ITU)-এর সদস্যপদ লাভ করে। শুধু তাই নয়, তিনি বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র নির্মাণ করেন ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন। যার ফলে বাংলাদেশ সহজেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে। একটি দেশের উন্নতিতে বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখা অত্যাবশ্যকীয়, যা বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টির কারণে এর সুফল আমরা ভোগ করছি। আমাদের দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৬১ সালে পাবনা জেলার রূপপুরে। কিন্তু প্রকল্পটি অনিবার্য কারণে স্থগিত হয়ে যায়। 'স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্থগিত হয়ে যাওয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০২৫ সাল নাগাদ ২৭টি দেশে ১৭৩টি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। এগুলোর মধ্যে ৩০টি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রই নির্মাণ করা হবে পরমাণু বিশ্বে নবাগত দেশগুলোয়, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। ১৯৭৩ সালে তিনি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন গঠন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)' প্রতিষ্ঠা করেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু ইন্টারনেটহীন বিশ্বে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে কীভাবে স্মার্ট রাষ্ট্র হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন।

আজ যে 'স্মার্ট প্রজন্ম' অর্জনের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ, তার ভিত্তি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হাতের স্থাপন করা। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন- দেশে

আধুনিক শিল্পায়ন, সড়ক-নির্মাণ, নদী খনন, রেল সংযোগের পরিধি বাড়ানো, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ বহুমুখী ক্ষেত্রে দ্রুত দেশকে পুনর্গঠিত করার।

বঙ্গবন্ধু চাইতেন– প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ধানের জমির পাশ দিয়ে ভালো সড়ক হবে, যাতে কৃষকদের প্রতিষ্ঠা পেতে সুবিধা হয়। গ্রামে গ্রামে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয় সব সুবিধা গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। এমনকি নতুন প্রজন্মের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা, নারী শিক্ষা, সর্বোস্তরের মানুষের জন্য সাম্যভিত্তিক অর্থনৈতিক মুক্তি, অসাম্প্রদায়িক সমাজব্যবস্থা কায়েম, মানবিক রাষ্ট্র গঠনের তাঁর নেয়া নানান উদ্যোগ আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর এসবই তিনি করেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার তিন বছরের মধ্যে। আমরা এতটাই অভাগা যে তাঁর মতো একজন মহামানবকে ধরে রাখতে পারিনি।

কিন্তু তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করছেন তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে ২০১৮ সালে দেশকে নিয়ে গেছেন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা এ তিনটি সূচকে শর্ত অনুযায়ী উন্নতি করায় জাতিসংঘ ২০১৮ সালের মার্চে প্রথমবারের মতো এবং ২০২১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্তভাবে এই সুপারিশ করে। ২০২৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পাচ্ছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বিশ্বের ৪৬টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে। ১৯৭৫ সাল থেকে এ তালিকায় ছিল বাংলাদেশ। ২০১৫ সালের জুলাইয়ে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়। এখন জাতিসংঘের মাপকাঠিতেও বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘ তার সদস্যদেশগুলোকে স্বল্পোন্নত (এলডিসি), উন্নয়নশীল ও উন্নত এই তিন পর্যায়ে বিবেচনা করে। জন্মের ৫২ বছরেই মধ্যেই দুর্বার গতি নিয়ে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর শুরু করা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পরিপূর্ণতা পায় তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। তিনি ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের ঘোষণা দেন। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। সবার জন্য কানেকটিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নমেন্ট ও আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রমোশন এই চার সুনির্দিষ্ট স্তম্ভের ওপর বাস্তবায়িত হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। আর ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২' এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক ঐতিহাসিক ঘোষনা দেন। তিনি বলেছেন, আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব। সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা চলে যাব।'

কারণ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জানেন, কিভাবে বাংলাদেশের ভাগ্য বদলাতে হয়। তাই তো সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের যতগুলো ধাপ রয়েছে, বাংলাদেশ একের পর এক অতিক্রম করে চলছে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে মেগা প্রকল্প। স্বপ্নের পদ্মা সেতু দিয়ে আজ লাখো মানুষ চলাচল করছে প্রতিনিয়ত। নগরজুড়ে অনুরণিত হচ্ছে মেট্রোরেলের প্রতিধ্বনি। অন্তরীক্ষে শোভা পাচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। জল-স্থল আর অন্তরীক্ষের পর পাতালে হচ্ছে বিশাল উন্নয়নযজ্ঞ। আশা জাগাচ্ছে পাতাল রেল। মাত্র এক যুগের ব্যবধানে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়া, অর্থনীতিতে দ্রুত বর্ধনশীল পাঁচ দেশের তালিকায় জায়গা করে নেওয়া, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য) অর্জন, এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য) বাস্তবায়ন, পদ্মা সেতু নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেল, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেল ও ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ, ২ ডজনের অধিক হাইটেক পার্কসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন-সবই শেখ হাসিনার জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে ক্যারিশমেটিক ও দূরদর্শী সফল নেতৃত্বের ফল, যিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাচ্ছেন সোনার বাংলা তৈরির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রফতানিমুখী শিল্পায়ন, তথ্য প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, রফতানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকে দেশ যেভাবে দ্রুতগতিতে

এগিয়ে যাচ্ছে; তাতে সহজেই অনুমেয়- আগামীর বাংলাদেশ ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশের সারিতে কাঁধ মেলাতে সক্ষম হবে।

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে জাতির পরিচয় দিয়েছিলেন, ভিত্তি রচনা করেছিলেন, আজ স্বাধীনতার ৫২ বছর পর এক সুবর্ণলগ্নে সেই জাতিকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তি দিয়েছেন তাঁরই উত্তরসূরি শেখ হাসিনা। পিতার অসমাপ্ত কাজকে তিনি পরম মমতায় নিজ হাতে সমাপ্ত করে যাচ্ছেন। তাঁর ভাষায় শুনি আমরা, 'বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ আরও আগেই একটি উন্নত দেশে পরিণত হতো।'

ডা. বার্নাড লন বলেছেন, 'যিনি অদৃশ্যকে দেখতে পারেন তিনিই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অদৃশ্যকে দেখতে পেরেছেন বলেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের স্বপ্ন- এদেশে সেই অর্থনৈতিক ভিত রচিত হবে, যা প্রতিটি মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের পথ খুঁজে দেবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতির পিতার স্বপ্ন আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষনার সাথে একাত্মতা পোষন করে সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব- এই হোক আমাদের দীপ্ত অঙ্গীকার।

তথ্যসূত্র :

- এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ- মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু
- দ্য ডেইলি স্টার। অনলাইন রিপোর্ট ১২-১২-২০২২
- দৈনিক কালের কণ্ঠ, প্রকাশের তারিখ : ০৬-০১-২০২৩
- দৈনিক জনকণ্ঠ। প্রকাশ : ১৯-০১-২০২৩
- স্মার্ট বাংলাদেশ : আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১, দৈনিক ইত্তেফাক। প্রকাশ : ২৩-০২-২০২৩
- উইকিপিডিয়া।

স্মার্ট লাইব্রেরি ও আলোর পথযাত্রী পাঠাগার

গ্রন্থাগারের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। বই উদ্ভাবনের অনেক আগেই গ্রন্থাগারের জন্ম। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ মাটির ফলকে লিখে রাখা হতো। আড়াই হাজার বছরেরও আগে অ্যাসিরিয়ার রাজা আশুরবানিপাল মৃৎফলকের গ্রন্থাগার করেছিলেন। তাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মাটির ফলক ছিল। প্রাচীনকালের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থাগার হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার। সাধারণ পাঠাগার প্রথম গড়ে ওঠে রোমে। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রোমে ২৫টিরও বেশি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাদশা হারুন-অর-রশিদের পাঠাগারের বেশ সুনাম ছিল। এশিয়া মহাদেশের পূর্বাঞ্চলের কনফুসিয়াস ও বুদ্ধের ধর্মাদর্শে প্রভাবিত সমাজগ্রন্থ এবং গ্রন্থাগারকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে এসেছে। মুসলিম বিশ্বে কর্ডোভা, দামেস্ক ও বাগদাদেও বেশ কিছু গ্রন্থাগার ছিল।

এককালে প্রচলিত অর্থে গ্রন্থাগারকে বলা হতো 'কুতুবখানা'। আধুনিককালে গ্রন্থাগার আর প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এখানে স্থান করে নিয়েছে 'ইলেক্ট্রনিক বুকস'। 'ইলেক্ট্রনিক বুকস' মানেই কম্পিউটার-মাধ্যমে পড়াশোনা ও আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করা। বর্তমানে পৃথিবীর বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে ব্রিটেনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ফ্রান্সের বিবলিওথিক ন্যাশনাল লাইব্রেরি, আমেরিকার লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, মস্কোর লেনিন লাইব্রেরি, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে ১৯৫৩

সালে ঢাকায় কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধারায় হালে যুক্ত হয়েছে আলোর পথযাত্রী পাঠাগার।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করে পৃথিবী দ্রুত এগিয়ে চলছে, যেখানে ছাপাখানায় মুদ্রিত বই, পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য দলিল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও জ্ঞান সংগ্রহের পদ্ধতিও পাল্টে যাচ্ছে ক্রমশ। প্রযুক্তি যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলোর মধ্যে গতির সঞ্চার করেছে তেমনি গ্রন্থাগারে প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজগুলোকে সুসংগঠিত করেছে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে হয়েছে উন্নত প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং মানুষ সেই নিত্য নতুন আবিষ্কারের সাথে খাপ খাইয়ে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। গ্রন্থাগারগুলো যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির সাথে চলার চেষ্টা করছে। গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সঠিক ব্যবহারকারীদের হাতে পৌঁছে দেয়া। এজন্যই গ্রন্থাগারগুলোতে পাঠক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। আলোর পথযাত্রী পাঠাগারও এর ব্যতিক্রম নয়। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আলোর পথযাত্রী পাঠাগার এ যুক্ত হচ্ছে নানামুখী উদ্যোগ।

কখনো কি কেউ ভেবেছেন, পাঠাগার বা বইয়ের দোকানে হেঁটে যাওয়ার আগেই আপনার দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছে সদ্য প্রকাশিত কোনো বই? কিংবা স্কুলে রাশি রাশি বইয়ের বোঝা না বয়ে বই নিয়ে যাচ্ছে কোনো ব্যাগ ছাড়াই? অথবা আপনার বুক পকেটে কয়েকশ' বই? এখন এসব কিছুই অসম্ভব নয়। একসময় বিজ্ঞান কল্পকাহিনি ছাড়া কোথাও এমনটা ভাবা না গেলেও এখন কিন্তু এটি সম্ভব। আজকাল প্রযুক্তির বদৌলতে স্মার্টফোন আর ট্যাব মানুষের হাতে হাতে চলে এসেছে। ফলে জীবনটা হয়ে গেছে অনেক সহজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকিং বা ইনস্টাগ্রামে ছবি আপলোড করা ছাড়াও দারুণ সব কাজ করা যায় একটি স্মার্টফোন আর মোটামুটি গতির ইন্টারনেট থাকলেই।

এ ব্যাপারে প্রাবন্ধিক ও গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন বাবুল বলেন, 'অন্যান্য সেক্টরের মত গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। পাঠক এখন আর পাঠাগারে গিয়ে সেলফ্ থেকে বই খুঁজে বের করে পড়ার যে প্রবণতা তা অনেকটাই কমে গেছে। যদিও পাঠাগারে বসে বই পড়ার যে আনন্দ তা পুরোপুরি অনলাইন পাঠাগার দিতে পারবেনা। তারপরও

কাগজের বইয়ের পাশাপাশি লেখাপড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণার জগতে এরই মাঝে ই-বইও বেশ ভালো জায়গা করে নিয়েছে। আলোর পথযাত্রী পাঠাগারও তাদের নিজস্ব ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মূল ধারায় সম্পৃক্ত হয়েছে। এতে পাঠকরা ঘরে বসেই গ্রন্থাগারের সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন।'

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আলোর পথযাত্রী পাঠাগার চালু করেছে অনলাইনভিত্তিক গ্রন্থাগার। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লক্ষ্য ২০৪১ সালে এদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে চালু করা হয়েছে *আলোর পথযাত্রী পাঠাগার* এর নিজস্ব ওয়েব সাইট www.alorpothjatri.com।

এ ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে নাম, মোবাইল নাম্বার ও ইমেইল এড্রেস দিয়ে যে কেউ নিবন্ধন করতে পারছেন। নিবন্ধিত সদস্যরা নীতিমালা অনুসরণ করে নিজেরাই তাদের লেখা গল্প কবিতা আপলোড দিয়ে প্রকাশ করতে পারছেন। বইয়ের মাঝে আনন্দ, শিক্ষা, জীবনকে গড়ে তোলার স্বপ্নময় জগৎ আছে, সেই স্বপ্নের জগতের সন্ধান দিবে আলোর পথযাত্রী পাঠাগার। আলোর পথযাত্রী পাঠাগারের ওয়েব সাইটে প্রকাশিত লেখা থেকে নিয়মিত বই প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ ওয়েব সাইটে শিল্প সাহিত্য সংক্রান্ত খবরাখবর প্রকাশ করছে। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময়, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানকারীদের নিয়ে টক শো ও সাহিত্যিক আড্ডার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পিং, গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, অসহায় ও দুস্থদের পাশে দাঁড়ানোসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আলোর পথযাত্রী পাঠাগারের সম্পৃক্ততা নতুন প্রজন্মকে মানবিক হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

সফলতায় : আত্মবিশ্বাস আর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

সফলতার মুকুট মাথায় পরতে কে না চায়? তরুণ শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে মধ্যবয়স্ক একজন উদ্যোক্তাও চান সফলভাবে নিজের ক্যারিয়ার দাঁড় করাতে। কিন্তু অনেকেরই ধারণা, সাফল্য অর্জন বেশ কঠিন। তবে সফল হতে গেলে যেটা সবার আগে প্রয়োজন, তা হলো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানসিকভাবে শক্ত হওয়া। অনেকেই নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ভাগ্যকেই দোষারোপ করতে থাকেন। পরিস্থিতি যে সব সময় অনুকূল হবে তা কিন্তু নয়। পরিস্থিতি আপনার প্রতিকূলেও যেতে পারে, এটা অবশ্যই মাথায় রাখা দরকার। সেই কথা মাথায় রেখেই যে কোনও নতুন কাজ করা উচিত। এমনকি পরিস্থিতি যেমন আছে তেমন হিসেবে মেনে নিয়ে উত্তরণের পথ বেছে নিতে হবে।

আমি যখন ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র, তখন আমার ফোর সাবজেক্ট ছিল 'পরিসংখ্যান'। পরিসংখ্যান বিষয়টি নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলাম। একদিন নিজের সাথে খুব জেদ হলো, সবাই পারলে আমি কেন পারবো না? আমি তখন কলেজের উত্তর ছাত্রাবাসের ৩০২ নাম্বার রুমে থাকি। একদিন সন্ধ্যায় পরিসংখ্যান বই নিয়ে বসে পড়লাম। একে একে পরিসংখ্যান বিষয়ের সকল চাপ্টার পড়ে ও লিখে শেষ করলাম। লিখতে গিয়ে এক সময় হাত ব্যথা শুরু করলো, তারপরও থামতে ছিলাম না। যত কষ্টই হোক আমাকে শেষ করতেই হবে। অবশেষে বইয়ের সকল চাপ্টার শেষ করে আনন্দের নিশ্বাস ফেললাম, মনে হলো যেন যুদ্ধ জয় করে ফেলেছি। ইতোমধ্যে মসজিদের মাইকে মোয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি ভেসে আসলো। মনে হচ্ছিলো এশার নামাজের আযান আজকে দেরি করে দিয়েছে কিনা? কিন্তু না জানালা খুলে দেখি বাইরে অনেকটাই দিনের আলোর ঝলক। প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনের উদ্দেশ্যে রুমের দরজা খুললাম। দেখি

পাশের রুমমেট নামাজ পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নামাজে যাওয়ার সময় আমাকে বলল, "ফজর নামাজ পড়লে সারাদিন ভালো কাটে।" তাঁর কথা শুনে বুঝলাম, কাজের ব্যস্ততার মধ্যে কখন রাত পার হয়ে গেছে টেরই পাইনি। তারপরও শরীরে এতটুকু ক্লান্তি আসেনি। পরবর্তীতে এই সাবজেক্টে আমি সবোর্চ্চ নম্বর পেয়েছিলাম? আমার মনে আছে, কলেজের অডিটোরিয়ামে পরিসংখ্যানে ভাইভা নিচ্ছিলেন একই কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবুল হোসেন স্যার। তিনি একে একে প্রশ্ন করছেন আমি উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। এক পর্যায়ে নিজের আত্মবিশ্বাসের জোরে বিনয়ের সাথে স্যারকে বলি, "এই বই আমার পুরো নখদর্পনে। আপনি যেকোনো জায়গা থেকে প্রশ্ন করতে পারেন, আমি উত্তর দিতে পারবো।" স্যার পনের মিনিট ধরে আমারে পুরো বইয়ের এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত প্রশ্ন করতে লাগলেন, আর আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। এক পর্যায়ে স্যার আমাকে "ভেরি গুড" বলে আমার মাথায় হাত রেখে আদর করে বিদায় দিলেন এবং আমি চলে আসলাম।

প্রচণ্ড কায়িক বা মানসিক শ্রমের পরও যদি মনকে বলি 'আমি টায়ার্ড হচ্ছি না, আমার শরীর খারাপ নয়' এই ধারনা সচেতনভাবে বিশ্বাস করানো যায় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে শরীর আপন ইচ্ছা অনুযায়ী চালিত হয়।

পৃথিবীর যে-কোনো কর্মবীরের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবেন তাঁরা যে খুব সচ্ছল ছিলেন তা নয়, তবে মানসিক ও আত্মিক দিক দিয়ে এঁরা অত্যন্ত সুসংহত ছিলেন। ভীতি, দুর্ভাবনা, নিঃসঙ্গতাবোধ, শৈশবে দেখা বাবা-মার কোন অপরাধ আচরণ মানুষকে তাঁর আত্মিক জগতে ভারসাম্যহীন করে তোলে। ফলে অহেতুক প্রকৃতিদত্ত শক্তির অপচয় হয়ে যায়। এটা ধ্রুব সত্য। আমাদের শারীরিক অবস্থা অনেকাংশে মানসিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং আমাদের মানসিক অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের চিন্তার গতি প্রকৃতি দ্বারা।

শিল্প কারখানায় দেখা গেছে যারা যন্ত্রের ছন্দের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে তারাই সবচেয়ে ভালো কর্মী হয়। যন্ত্রকে ভালোবাসতে শিখলে দেখতে পাবেন তার মধ্যেও ছন্দ আছে। আপনার দেহ যন্ত্রে, নার্ভে, আত্মার সুরের মত একই সুর বাজে। এবং ওই সুরের ছন্দে চললে আপনি কখনও ক্লান্ত

হবেন না। আপনার স্টোভের, টাইপ রাইটারের, অফিসের মোটর গাড়ির কাজের প্রতিবারই ওই ছন্দের সাথে একাত্ম হোন।

কাজ করতে হয় আনন্দের সহিত। ভালোবেসে ওই কাজে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। নিজের মধ্যে কিছু না রেখে তাতে নিমগ্ন হয়ে যান। নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসুন। আপনি কেউ একজন, একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করুন। কোনো কিছু করছেনা বলে ঘাবড়াবেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ অবস্থাতেই বলেছিলেন, "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।" যিনি বেরিয়ে আসতে পারবেন তিনি কখনও ক্লান্ত হবেন না।

নিজের চাইতে বড় বিষয়ে আত্মনিয়োগ করুন, তাহলে নিজেকে নিয়ে ভেবে ভেবে মানসিক দুর্ভাবনার বেড়াজালে আটকে পড়ে আর হাঁসফাঁস করতে হবে না। কাজেই জীবনকে সামগ্রিকভাবে এনার্জিতে ভরপুর রাখতে চাইলে নিজের মনোজগতের সকল বিক্ষিপ্ততাকে নিয়ন্ত্রিত করুন। আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হোন।

স্রষ্টার সকল প্রাণিকুল থেকে আমাদের সেরা করে বানিয়েছেন। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে নিজেকে ছোট ভাবার কোন কারণ নেই। সমুদ্রের বিশালতার মত আমাদের মনটাকে অনেক বড় ভাবতে হবে। সকল চিন্তা চেতনায় ইতিবাচর দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে কফি আনানের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। কফি আনান তখন মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী। গণিতের এক ক্লাসে তাঁর শ্রেণি শিক্ষক সাদা বোর্ডে মার্কার দিয়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু দেখিয়ে সবাইকে একে একে জিজ্ঞেস করলেন, শিক্ষার্থীরা তোমরা বোর্ডে কি দেখতে পারছো। সবাই একে একে উত্তর দিচ্ছে বোর্ডে কয়েকটি কালো দাগ দেখতে পারছি। সবার শেষে কফি আনানকে তাঁর স্যার জিজ্ঞেস করলেন, কফি তুমি কি দেখতে পারছ? কফি আনান উত্তর দিলেন, স্যার আমি বোর্ডে বিশাল সাদা অংশ দেখতে পারছি। তখন ওই শিক্ষক কফি আনানকে বলেছিলেন, কফি তুমি অনেক বড় হবে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কফি আনান ঠিকই অনেক বড় হয়েছিলেন। তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব হয়েছিলেন।

আমেরিকার ফুটবল খেলোয়ার জগতের বিখ্যাত কোচ নুট রকের বক্তব্য ছিল এরকম, 'একজন খেলোয়ার যথেষ্ট এনার্জি পাবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না সে

তার আবেগ নিয়ন্ত্রিত করতে না পারে।' তাঁর বক্তব্য ছিল একজন খেলোয়ার যতক্ষন পর্যন্ত তার সহযোগী খেলোয়ারদের সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভাল খেলতে পারবে না। ঘৃণা বা হিংসা শক্তিকে ব্যাহত করে এবং পরিমিত শক্তি ব্যবহার এ অবস্থায় কখনও সম্ভব হয়না। দেখা গেছে যাদের প্রাণ শক্তির ঘাটতি আছে তারা কোনো না কোনোভাবে আবেগ এবং মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়, শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করে ব্লাক বোর্ডে একটা লম্বা দাগ টানলেন। এবার সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে জানতে চাইলেন, আচ্ছা তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো? যে দাগটিকে ছোট করতে পারবে? কিন্তু শর্ত হচ্ছে তোমরা একে মুছতে পারবে না!! না মুছেই ছোট করতে হবে। তারপর সব ছাত্র/ছাত্রীই অপারগতা প্রকাশ করলো। কারণ মোছা ছাড়া দাগটিকে ছোট করার আর কোনো পদ্ধতি তাদের মাথায় আসছিলো না।

এবার শিক্ষক দাগটির নিচে আরেকটি দাগ টানলেন, যা আগের টির চেয়ে একটু বড়। ব্যস...!

আগের দাগটি মোছা ছাড়া ছোট হয়ে গেলো।

শিক্ষক এবার বললেন, বুঝতে পারলে তোমরা? কাউকে ছোট করতে বা হারাতে হলে তাকে স্পর্শ না করেও পারা যায়!

নিজেকে বড় করে গড়ে তুলো, তাহলেই অন্যের সমালোচনা করে তাকে ছোট করতে হবে না, তুমি বড় হলে এমনিতেই সে ছোট হয়ে যাবে।

সফলতার পথে এক কঠিন বাধা আত্মবিশ্বাসহীনতা। এটি একটা মারাত্মক সমস্যাও। আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে প্রায় ছয়শো শিক্ষার্থীর উপর জরিপ করা হয়েছিল। ওদের বলা হয়েছিল প্রত্যেকের নিজ নিজ সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত সমস্যা কি চিহ্নিত করার জন্য। ফলাফলে দেখা গেল শতকরা পঁচাত্তর জন শিক্ষার্থীই একটি সমস্যা চিহ্নিত করল। আর সেটা হলো-আত্মবিশ্বাসহীনতা। আমাদের দেশে এরকম কোনো সার্ভে হলে আমার মনে হয় শতকরা প্রায় একশো ভাগই ওই সমস্যাকে চিহ্নিত করবে। প্রায় সর্বত্র আপনি দেখবেন বেশিরভাগ মানুষ ভিতরে ভিতরে ভীত হয়ে আছেন, জীবন থেকে পালিয়ে বেড়াতে চাচ্ছেন, অপূর্ণতা এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। নিজের কক্ষতাতেই, এঁদের

বিশ্বাস নেই। এঁরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করা কিংবা দায়িত্ব গ্রহণের অনীহায় ভোগেন। তাঁরা ভাবেন যে তাঁরা অক্ষম। তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে তাঁরা যা হতে চান তাকে রূপায়িত করার ক্ষমতা নিজেদের ভেতরেই আছে। ফলে তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার চাইতেও অনেক কম ক্ষমতা নিয়ে তৃপ্ত থাকেন। হাজার হাজার মানুষ কেবলমাত্র এইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে, পরাজিত হয়ে, ভীত হয়ে জীবন কাটায়। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই হতাশা অর্থহীন, অলীক।

হেনরি ডেভিট থোরো এর বক্তব্য 'আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার স্বপ্ন অনুসরণ করুন। আপনি যে জীবন যাপন করতে চান তা যাপন করুন।'

কানাডার বিখ্যাত লেখক বাসিল কিং এর বক্তব্য, 'সাহসী হোন, প্রচণ্ড শক্তি আসবে আপনাকে সাহায্য করার, অভিজ্ঞতা এ সত্যকে প্রমানিত করছে।'

কাজেই আত্মবিশ্বাসী হোন, ভীতি নিরাপত্তাহীনতা আপনাকে কাবু করতে পারবেনা। উৎসাহ উদ্দীপনা যে-কোন কাজকে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর করে তুলতে পারে। নিজের কাজকে ভালোবাসুন। যদি না পারেন তাহলে শিখে নিন। নিজে পরীক্ষা করুন, বিশ্লেষণ করুন, কি সম্ভবনা আছে তা দেখে নিন। কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে–

মানুষ, আমরা সবাই
অসীম ক্ষমতার অধিকারী
প্রয়োজন শুধু সচেতনতার।
কোনো সমস্যাই অনতিক্রম্য নয়
দরকার শুধু সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আর আত্মবিশ্বাস
– এই হলো সাফল্যের মূলমন্ত্র।

তথ্যসূত্র :

- 'স্বর্ণশিখর' - বিশু চৌধুরী
- দৈনিক সমকাল। প্রকাশ : ২৮-০১-২০১৬

রিপোর্টারের ডায়েরী

প্রতিদিনকার মত ফজরের নামায পড়ে কাজিন নূরে আলম ভাইয়ের সাথে প্রাতঃভ্রমণে বের হই। বাড়ি থেকে চামুরকান্দি হয়ে দাসপাড়া গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় আধ ঘণ্টা থেকে প্রায় পৌনে একঘণ্টা হাঁটার পর বাড়ি ফিরি। ডায়াবেটিকস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে দু'জনেরই এই সময়টুকু হাঁটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। ১০ ডিসেম্বর ২০১৫। দিনটি ছিলো বৃহস্পতিবার। ওই দিন ভোরে প্রাত:ভ্রমণে বের হয়ে দাসপাড়া থেকে ফেরার পথে মোবাইলে রিংটোন বেজে উঠে। অচেনা নাম্বার! সংবাদপত্রের কাজ করার কারণে এ সময়গুলোতে সাধারণত ফোন রিসিভ করতেই হয়। এসময়টাতে কোন না কোন ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর আসে। ফোন রিসিভ করতেই অপরপ্রান্ত থেকে জানানো হলো পুরিন্দা বাজারে গণপিটুনীতে ৮/১০জন ডাকাত মারা গেছে! কলারের পরিচয় জানার আগেই লাইন কেটে যায়। এর মিনিট পাঁচেক পর আরেকটি ফোন আসে সাতগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব অদুদ মাহমুদের। তিনিও একই কথা জানিয়ে বলেন, "হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে। দ্রুত পুরিন্দা বাজারে চলে আসেন।" এ কথা শোনার পর বাড়ি ফেরার জন্য দ্রুত হাঁটা শুরু করলাম। কিন্তু রাস্তা যেন কিছুতেই ফুরাচ্ছেনা। এক সাথে এতগুলো লোক গণপিটুনীতে মারা যাওয়ার ঘটনা আড়াইহাজারে এই প্রথম। বাড়ি এসে ক্যামেরা ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সাথে নিয়ে মোটর সাইকেল যোগে পুরিন্দা বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

সকাল তখন সাতটা। কামরাণীরচর ব্রীজ পার হয়ে পাঁচগাও সীমান্তে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল নসিমন দিয়ে পাঁচজনের লাশ থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দ্রুত গতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে হালকার উপর যতোটা সম্ভব পাবলিক সেন্টিমেন্ট বুঝার চেষ্টা করছি। আশপাশে কোনো সংবাদকর্মী তখনও চোখে পড়েনি। ভাবছি এত সকালে হয়তো

তাদের কাছে এ ঘটনার খবর পৌঁছায়নি কিংবা খবর জানলেও আসতে দেরি হচ্ছে। অবস্থা বুঝে ক্যামেরা অন করে বেশ কয়েকটি ছবি তুললাম। ইতোমধ্যে ডাকাত সন্দেহে সোহাগ নামে এক যুবককে পাশ্ববর্তী জঙ্গলের বাঁশঝাড় থেকে এনে বিক্ষুব্ধ জনতা বেধরক পেটাতে থাকে। প্রায় ১৫ মিনিট পেটানোর পর একসময় সেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। একজন মানুষ হিসেবে চোখের সামনে এমন মৃত্যুর দৃশ্য আমার জীবনে প্রথম দেখা কোনো ঘটনা। খারাপ লাগলেও কিছু করার ছিলোনা। কয়েক হাজার উত্তেজিত লোকসমাগমের সেন্টিমেন্ট বিবেচনায় নিজেকে সেইফ রেখে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। তারপরও নিজের মধ্যে কেন জানি কোন মনস্তাত্ত্বিক রক্তক্ষরণ হচ্ছে না। কেনইবা হচ্ছেনা? মনে পড়ে গেল এ ঘটনার চার বছর আগের কথা। রমজানের এক রাতে সাহরী রেডি করার জন্য মা রান্না ঘরের উদ্দেশ্যে থাকার ঘর থেকে বের হন। কারণ আমাদের থাকার ঘর আর রান্নাঘর ছিলো ভিন্ন স্থানে। মা রান্না ঘরে গিয়ে পাঁক করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এসময় বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতদল হানা দেয়। ডাকাতেরা ধাড়ালো অস্ত্র দিয়ে পরিবারের লোকদের একের পর এক জখম করতে থাকে। উপর্যুপরি আঘাতে বড় ভাইয়ের কয়েকটি আঙ্গুল চিরদিনের জন্য অকেজো হয়ে যায়। এ ঘটনাটি প্রতিনিয়ত আমাকে পীড়া দেয়। মনে হলে, এখনও আতঙ্কিত হয়ে পড়ি।

এদিকে পুরিন্দা বাজারে অবস্থানকালেই দৈনিক সমকাল অনলাইন বিভাগে ফোনে নিউজ প্রেরণ করি। সেখান থেকে কাজ শেষ করে আড়াইহাজার পুলিশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ইতিমধ্যে থানায় পৌঁছার আগেই সমকাল অনলাইনে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পত্রিকা অফিস থেকে সর্বশেষ আপডেট সাথে সাথে দেয়ার জন্য বেশ কিছু নির্দেশনা প্রদান করে।

বেলা তখন ১১ টা। থানায় এসে দেখি আট জনের লাশের সারি। সারি করে রাখা অর্ধনগ্ন লাশগুলো দেখে মনে হচ্ছিল নৌডুবিতে তাদের মৃত্যু হয়েছে। পরিচয় শনাক্ত করার জন্য এমনভাবেই তাদেরকে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ভাবছি অন্তত এই ঘটনার পর এলাকাতে কিছু সময়ের জন্য হলেও ডাকাতির কবল থেকে এলাকাবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। নিহত ডাকাতদের মধ্যে একজনের নাম রনি। সে গাড়ি ড্রাইভিং করতো। গ্রামের বাড়ি ফেনীর সোনাগাজি হলেও সে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করত

রাজধানীর দনিয়া এলাকায়। খবর পেয়ে রনির স্ত্রী ও তার শিশু-সন্তানকে সাথে নিয়ে আড়াইহাজার থানায় আসে। স্বামীর লাশ দেখে রনির স্ত্রী নাজমা বেগম বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। নিহত রনির ছয় বছরের শিশু কন্যা তার বাবার মুখটি দিকে তাকিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলো। এক পর্যায়ে নিথর দেহটিকে জড়িয়ে শিশুটি 'বাবা...ও বাবা...উঠ..উঠ বাবা.. ' বার বার এ কথা বলে তার বাবাকে ডাকছে। কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে শিশুটি তার বাবার মুখটি হাত দিয়ে নড়াচড়া করছে। বাবা নেই এ কথাটি যেন তাকে কেউ বিশ্বাস করাতে পারছেনা। থানা ভিতরে প্রচুর লোকজনের সমাগমে জটলা তৈরি হয়। মুহূর্তের মধ্যেই থানার কোলাহলময় পরিবেশ যেন শিশুটির কান্নার আহাজারিতে একেবারেই নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে যায়। নিজেকে সামলাতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গেলাম। শিশুটির কান্নায় অজান্তেই আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। শিশুটি তার বাবাকে আর কোনোদিন বাবা ডাকতে পারবেনা? হৃদয় বিদারক এ দৃশ্য সইতে না পেরে অবশেষে থানা এলাকা দ্রুত ত্যাগ করতে হলো...। ফিরে এলাম পেশাগত দায়িত্বে। কিন্তু সেদিনের এই বেদনায়ক ঘটনাটি এখনও ভুলতে পারিনি। বাবা হারানো ছোট্ট শিশুর সেদিনের কান্নার আওয়াজ যেন আজও কানে বাজছে...

বিশ্বের প্রথম পরিবেশবান্ধব প্লাটিনাম গ্রিন কারখানা

আড়াইহাজার

মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

আড়াইহাজারে মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কারখানা ■ সমকাল

■ **সফুরউদ্দিন প্রভাত,** *আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ)*

বিশ্বে শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে টেক্সটাইল ও ডাইং সেক্টর অন্যতম। এ সেক্টরকে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে রেড ক্যাটাগরি বা সর্বোচ্চ বিপজ্জনক শ্রেণিতে বিবেচনা করা হয়। প্রচলিত এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতে নিজেদের প্রমাণ করেছে মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এটি ওভেন টেক্সটাইল ডাইংয়ে সারাবিশ্বের প্রথম পরিবেশবান্ধব প্লাটিনাম গ্রিন কারখানা। রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে অজপাড়াগাঁয়ে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার দুপ্তারার অন্যতম পুরোধা শিল্পোদ্যোক্তা খান পরিবারের সদস্যরা প্রতিষ্ঠা করেন লিড প্লাটিনাম ওভেন টেক্সটাইল ডাইং কারখানাটি।

রপ্তানিমুখী মিথিলা গ্রুপের এ কারখানাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ২০১৫ সালে এবং এটি পরিপূর্ণভাবে উৎপাদন শুরু করে ২০১৯ সালের প্রথমদিকে। কারখানাটি স্থাপনে নেওয়া হয়েছে ৩৬ বিঘা জমি। এর ৫০ ভাগ জায়গাই ফাঁকা, যেখানে বনায়ন করা হয়েছে। তিন বিঘার মধ্যে রয়েছে বিশাল একটি পুকুর। শেডের ওপরের বৃষ্টির পানি সরাসরি পুকুরে পড়ে। স্বচ্ছ জলধারার এ পুকুরের পানি বাগান ও অগ্নিনির্বাপণ কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া এই পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করা হয়েছে। পর্যাপ্ত খোলা জায়গা রেখে বাকি জায়গার ওপর গড়ে তোলা হয়েছে কারখানা ভবন। এখানে আছে শ্রমিকদের জন্য সর্বোচ্চ ও আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) এবং লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইনের (লিড) সনদপ্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রিন স্ট্যাটাস প্লাটিনাম ক্যাটাগরি ওভেন ফেব্রিক্স ডাইংয়ের এ কারখানাটি সারাবিশ্বে এখন পর্যন্ত প্রথম এবং একমাত্র সব ক্যাটাগরির শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে পঞ্চম শ্রেষ্ঠ গ্রিন ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠান।

সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আগামী প্রজন্মকে একটি ভালো পরিবেশ দেওয়ার লক্ষ্যে মিথিলা টেক্সটাইলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মিথিলা গ্রুপের পরিচালক মাহবুব খান হিমেল।

মিথিলা গ্রুপের আরেক পরিচালক কায়েস খান বলেন, এ প্রতিষ্ঠানটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে ছেষট্টি শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছে। এমনকি দিনের বেলায় কারখানায় কোনো বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

মিথিলা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোহেল খান বলেন, আমাদের মূল থিম হলো প্রোডাকশন সার্ভিস ইমপ্রোভমেন্ট অ্যান্ড কমিটমেন্টের স্বচ্ছতার মাধ্যমে বায়ারদের ইমপ্রেস করা, যার জন্য বিশ্বমানের প্রোডাক্ট আমরা দিতে পারছি। বিশ্বমানের ওভেন কাপড় তৈরির জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে মিথিলায়।

মিথিলা গ্রুপের চেয়ারম্যান আজাহার খান বলেন, বায়াররা যেটা চান, অর্থাৎ শতভাগ গুণগত মানসম্পন্ন ফেব্রিক্স, মিথিলা তাদের চাহিদা অনুযায়ী তা দিতে চেষ্টা করে। আমরা যেসব অত্যাধুনিক ফেব্রিক্স তৈরি করছি, বাংলাদেশে এর আগে কেউ তৈরি করতে পারেনি। আমাদের লেটেস্ট টেকনোলজি, লেটেস্ট মেশিনারিজ, এনভায়রনমেন্ট সেট, গ্রিন ফ্যাক্টরি পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে ওভেন ডাইংয়ের এ ফ্যাক্টরিতে

মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

বিশ্বে শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে টেক্সটাইল ও ডাইং সেক্টর অন্যতম। এ সেক্টরকে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে রেড ক্যাটাগরি বা সর্বোচ্চ বিপজ্জনক শ্রেণিতে বিবেচনা করা হয়। প্রচলিত এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতে নিজেদের প্রমাণ করেছে মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এটি ওভেন টেক্সটাইল ডাইংয়ে সারাবিশ্বের প্রথম পরিবেশবান্ধব প্লাটিনাম গ্রিন কারখানা। রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে অজপাড়াগাঁয়ে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার দুপ্তারার অন্যতম পুরোধা শিল্পোদ্যোক্তা খান পরিবারের সদস্যরা প্রতিষ্ঠা করেন লিড প্লাটিনাম ওভেন টেক্সটাইল ডাইং কারখানাটি।

রপ্তানিমুখী মিথিলা গ্রুপের এ কারখানাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ২০১৫ সালে এবং এটি পরিপূর্ণভাবে উৎপাদন শুরু করে ২০১৯ সালের প্রথমদিকে। কারখানাটি স্থাপনে নেওয়া হয়েছে ৩৬ বিঘা জমি। এর ৫০ (ইউএসজিবিসি) এবং লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইনের (লিড) সনদপ্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ আজাহার খান বলেন, বায়াররা যেটা চান, অর্থাৎ শতভাগ গুণগত মানসম্পন্ন ফেব্রিক্স, মিথিলা তাদের

অত্যাধুনিক ফেব্রিক্স তৈরি করা হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, মিথিলা বাংলাদেশকে বিশ্বের সামনে রিপ্রেজেন্ট করবে।

সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, মিথিলা গ্রুপের এ পরিবেশবান্ধব কারখানাটি দেশের তৈরি পোশাকশিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মিথিলা গর্ব করার মতো একটি ফ্যাক্টরি গড়ে তুলেছে।

এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন, একটি অজপাড়াগাঁয়ে বিশ্বের প্রথম লিড প্লাটিনাম সনদপ্রাপ্ত ওভেন ডাইং কারখানা মিথিলা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড পরিদর্শন করে সত্যিই অবাক হয়েছি। মিথিলা গ্রুপ সব আধুনিক পদ্ধতি স্থাপন ও ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন, জলবায়ু রক্ষা ও সবুজায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রতিষ্ঠানকে সবধরনের সহায়তা দেওয়া হবে।

সূত্র :

- দৈনিক সমকাল, প্রকাশ: ২০ নভেম্বর ২০১৯।

■ **সফুরউদ্দিন প্রভাত,** *আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ)*

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলা সদরের আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। দেশের আর দশটা সরকারি হাসপাতালের মতোই ছিল এই হাসপাতালের পরিবেশ।

তা শোনেন। আগের দিনের কাজের মূল্যায়ন শেষে দিনের কার্যক্রমের নির্দেশনা দেন। এরপর সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে বেরিয়ে পড়েন।

বদলের নেপথ্যে

জরুরি চিকিৎসাসেবা চালু করা হয়েছে। জরুরি ঘণ্টা ডায়াবেটিস ও ইসিজি পরীক্ষা চালু এব জীবাণুমুক্তকরণে অটোক্লেভ মেশিন বসানো হয়ে এক্স-রে মেশিন আনা হয়েছে। প্যাথলজি বিভা হয়েছে ক্লোরমিটার, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, মাইক্রো নেবুলাইজার। নরমাল ডেলিভারি বৃদ্ধির জন্য চিকি শিশুদের পুরস্কারের মাধ্যমে মোটিভেশন করা জানুয়ারি মাসে ১০৮ জনকে নরমাল ডেলিভারি ক গত ১৬ ডিসেম্বর থেকে হাসপাতালের শ্বাসকষ্টজনিত চিকিৎসাসেবার জন্য রেসপিরেটরি ইউনিট চালু ক রেসপিরেটরি ইউনিট এ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহ চিকিৎসক নার্সদের সমন্বয়ে শ্বাসকষ্ট রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া নিয়মিত ম মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সেবার মান হয়েছে। ইতোমধ্যে শিশুদের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কিডস জোন চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার মান বাংলাদেশে প্রথম সারিতে রয়েছে আড়াইহাজার উপ কমপ্লেক্স; যা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গা

সেবায় সন্তুষ্টি

হাসপাতালের কেবিনে গিয়ে কথা হয় কল্যান্দী পাড়াগাওয়ের মাহফুজের সঙ্গে। তারা জানান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাসপাতালেই করাতে পেরেছেন। হাসপাতাল থেকে পেয়েছেন। কেবিনের মেঝে টাইলস লাগানো। শৌচাগারও পরিষ্কার। সেব করছেন পার্শ্ববর্তী নরসিংদী মাধবদী থানার নুরালা গোল আক্তার। তিনি জানান, চিকিৎসক ও নার্স আমার খোঁজখবর নিচ্ছেন। সবচেয়ে ভালো হাসপাতালের দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশ।

আড়াইহাজার উপজেলা সরকারি হাসপাতাল এ মায়েদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করেন স্থানী হাইজাদী গ্রাম থেকে মায়ের সঙ্গে এসেছেন ফারজান প্রসূতি নারী। ডা. শান্তা ত্রিবেদী তাকে চেকআপে দিয়েছেন। সেবা পেয়ে ফারজানা বেশ সন্তোষ প্রক

একজন ডাক্তার সায়মা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলা সদরের আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। দেশের আর দশটা সরকারি হাসপাতালের মতোই ছিল এই হাসপাতালের পরিবেশ। ভেতরে-বাইরে নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, দালালদের উৎপাত। সেবার নিম্ন মান। এখন সেদিন বদলেছে। সর্বত্র লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। সেবার দিক থেকে প্রথম সারির সরকারি হাসপাতাল হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সরেজমিন একদিন

গত ৮ ফেব্রুয়ারি সকালে হাসপাতাল চত্বরে ঢুকতেই চোখে পড়ল ছিমছাম সবুজ চত্বর। চিরচেনা আবর্জনার স্তুপ নেই। ড্রেনগুলোও পরিষ্কার। ময়লার ভাগাড় ছিল মূল ভবনঘেঁষে দুটি বড় জায়গায়। তা এখন ফল-ফুলের বাগান। ভবনের চারপাশেই এমন বাগান হয়েছে। মূল ফটক থেকে ভবনের সামনের চত্বর পর্যন্ত সারি সারি বাহারি রঙের বৈদ্যুতিক বাতি। পেছনের ডরমিটরির সামনের জায়গাগুলো বিভিন্ন ফলদ গাছের সমারোহ। হাসপাতালের ছাদে করা হয়েছে ছাদবাগান।

ভবনে ঢুকতেই দুটি টিকিট কাউন্টার। সামনে সেবাপ্রত্যাশী মানুষের ভিড়। দুই টিকিট বিক্রেতার দম ফেলার ফুরসত নেই। হেল্পডেস্কের সামনেও ভিড়। মাথার ওপর ঝুলছে ডিজিটাল সাইনবোর্ড। তা জানান দিচ্ছে বিভিন্ন সেবার বার্তা। প্রতিদিন শুরুতে দৈনন্দিন কার্যসূচি উপস্থাপন করা হয়। ইউএইচএফপিও ডা. সায়মা আফরোজ ইভা মনোযোগ দিয়ে তা শোনেন। আগের দিনের কাজের মূল্যায়ন শেষে দিনের কার্যক্রমের নির্দেশনা দেন। এরপর সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে বেরিয়ে পড়েন।

বদলের নেপথ্যে

একের পর এক উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা যোগদান করলেও হাসপাতালটি সেবার মানের তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। ২০১৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর এই পদে ডা. সায়মা আফরোজ ইভা যোগদান করেন। তারপর থেকে বদলে যেতে থাকে উপজেলার পাঁচ লাখ মানুষের চিকিৎসাসেবার এই প্রধান ভরসার জায়গাটি। ডা. সায়মা আফরোজ ইভা প্রথমে হাসপাতালের চিরচেনা সমস্যা শনাক্ত করেন। এরপর তা সমাধানে উদ্যোগ নিতে শুরু করেন।

হাসপাতালের চিত্র বদলে নেপথ্যের কারণ সম্পর্কে ডা. সায়মা আফরোজ বলেন, মানুষের সেবা করাই আমার অনুপ্রেরণার উৎস। করোনা মহামারিকালীন আড়াইহাজার উপজেলা সব চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছেন। অধিকাংশ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হলেও আবার সুস্থ হয়ে মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। ফলে করোনায় আড়াইহাজারে প্রায় সব আক্রান্ত রোগীই সুস্থ হয়েছেন। করোনাকালীন সময় থেকে মানবতার দেয়াল চালু করার মাধ্যমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অসহায়, দুস্থ ও কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। সীমিত জনবল ও আসবাবপত্র সত্ত্বেও আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করা হয়েছে। প্রসূতি মা ও শিশুদের জন্য ২৪ ঘণ্টা জরুরি চিকিৎসাসেবা চালু করা হয়েছে। জরুরি বিভাগে ২৪ ঘণ্টা ডায়াবেটিস ও ইসিজি পরীক্ষা চালু এবং যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণে অটোক্লেভ মেশিন বসানো হয়েছে। নতুন এক্স-রে মেশিন আনা হয়েছে। প্যাথলজি বিভাগে বসানো হয়েছে

ক্লোরমিটার, সেন্টিফিউজ মেশিন, মাইক্রোস্কোপ ও নেবুলাইজার। নরমাল ডেলিভারি বৃদ্ধির জন্য চিকিৎসক, মা ও শিশুদের পুরস্কারের মাধ্যমে মোটিভেশন করা হচ্ছে। গত জানুয়ারি মাসে ১০৮ জনকে নরমাল ডেলিভারি করা হয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর থেকে হাসপাতালের শ্বাসকষ্টজনিত রোগীদের চিকিৎসাসেবার জন্য রেসপিরেটরি ইউনিট চালু করা হয়েছে। রেসপিরেটরি ইউনিট এ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নার্সদের সমন্বয়ে শ্বাসকষ্ট রোগীদের আধুনিক চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া নিয়মিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শিশুদের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কিডস জোন চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার মান বিবেচনায় বাংলাদেশে প্রথম সারিতে রয়েছে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; যা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের।

সেবায় সন্তুষ্টি

হাসপাতালের কেবিনে গিয়ে কথা হয় কল্যান্দীর সুবর্ণা ও পাঁচগাঁওয়ের মাহফুজের সঙ্গে। তারা জানান, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাসপাতালেই করাতে পেরেছেন। ওষুধপথ্যও হাসপাতাল থেকে পেয়েছেন। কেবিনের মেঝে ও দেয়ালে টাইলস লাগানো। শৌচাগারও পরিচ্ছন্ন। সেবার প্রশংসা করলেন পার্শ্ববর্তী নরসিংদী মাধবদী থানার নুরালাপুর গ্রামের গোল আক্তার। তিনি জানান, চিকিৎসক ও নার্সরা নিয়মিত আমার খোঁজখবর নিচ্ছেন। সবচেয়ে ভালো লেগেছে হাসপাতালের দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশ।

আড়াইহাজার উপজেলা সরকারি হাসপাতাল এখন প্রসূতি মায়েদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করেন স্থানীয় নারীরা। হাইজাদী গ্রাম থেকে মায়ের সঙ্গে এসেছেন ফারজানা নামে এক প্রসূতি নারী। ডা. শান্তা ত্রিবেদী তাকে চেকআপের পরামর্শ দিয়েছেন। সেবা পেয়ে ফারজানা বেশ সন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্তর্বিভাগের ওয়ার্ডে প্রবেশে বেশ কড়াকড়ি এখন। রোগীপ্রতি একজন দর্শনার্থী থাকতে পারেন। হাসপাতালে দালালদের দৃশ্যমান তৎপরতা নেই। নেই ওষুধ কোম্পানির লোকজনের অবাধ উপস্থিতিও। গোটা হাসপাতাল এলাকা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

লোকবলের সংকট, তবু অনেক স্বপ্ন

৫০ শয্যার এই হাসপাতাল চলে ৩১ শয্যার লোকবলে। প্রতিদিন সীমিত সংখ্যক চিকিৎসক দিয়ে বহির্বিভাগে ৫ শতাধিক রোগীকে সেবা দেওয়া হচ্ছে। ২৮টি চিকিৎসকের পদের মধ্যে ১৩টি দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। জরুরি বিভাগে আলাদা চিকিৎসকের পদ থাকার কথা থাকলেও এখানে একটিও নেই। তালিকা (রোস্টার) করে জরুরি বিভাগ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া ওয়ার্ডবয়, সুইপারসহ বেশ কয়েকটি পদে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এরপরও মডেল হাসপাতালে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের। এ জন্য দরকার নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র (আইসিইউ), কিডনির ডায়ালাইসিস সেবা, আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা যন্ত্র ইত্যাদি। সেগুলো চালুর আগেই নিশ্চিত করতে হবে দুটি বিষয় ৫০ শয্যার অনুকূলে জনবল এবং ২৫০ শয্যার নবনির্মিত ভবন চালু।

সূত্র :

- দৈনিক সমকাল, প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

স্বপ্ন যখন আকাশছোঁয়া

তরুণরা দেশের সম্পদ। তবে অধিকাংশ শিক্ষিত তরুণ চাকরি নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে গিয়ে বেকারের খাতায় নাম লেখান। তারা সম্পদে রূপান্তর না হয়ে দেশের বোঝা হয়ে যান। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মতিউর রহমান বিল্লাল। মেকানিকেল ও ইংরেজিতে স্নাতক শেষ করে চাকরি না খুঁজে নিজেই উদ্যোক্তা হওয়ার বাসনা নিয়ে কাজ শুরু করেন। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই সফল আত্মকর্মী হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হন। সকল প্রতিকুলতাকে পেছনে ফেলে আড়াইহাজার উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের কুমারপাড়া এলাকায় দশ বিঘা জমির উপর ২০২০ সালে 'আমিষ ফুডস এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' নামে সমন্বিত কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ১২৩ বিঘা জায়গা জুড়ে এ খামারের বিস্তৃতি। এ খামারে সম্পুর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে বিভিন্ন উন্নত জাতের গরু, ছাগল, হাঁস, মোরগ, দুম্বা ও সৌখিন জাতের পাখি এবং হরিণ লালন পালন করা হয়ে থাকে। এ খামারে ষাঁড় আছে ১৫৬টি এবং নিয়মিত দুধ দেয় এমন গাভির সংখ্যা ৪০টি। রয়েছে চার প্রজাতির ৩০০টি ছাগল, ৫টি হরিণ ও ৬০টি টার্কিশ দুম্বা। হাঁস ও মোরগের সংখ্যা এ খামারে প্রায় ৩ হাজার। বাণিজ্যিকভাবে দুধ ও মাংসের জন্য গরু বিক্রি করলেও মানুষকে নির্ভেজাল পণ্য পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ খামারে বর্তমানে কাজ করছেন অর্ধশতাধিক শ্রমিক। প্রথমদিকে একটি গরু ও একটি ছাগল নিয়ে খামার চালু করলেও এখন এ খামারে সম্পদের পরিমাণ প্রায় কয়েক কোটি টাকা। এরপর তাঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

পাশাপাশি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (এনআইইটি) এর চীফ প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পেয়ে তরুণ ও যুবকদের দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। সরকারি ও বেরসকারি অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতায় গত দশ বছরে আড়াইহাজার, রূপসী, ঢাকাসহ প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন শাখায় ১২ হাজার শিক্ষার্থীকে ইলেক্ট্রিকেল, রেফ্রিজারেশন এবং এয়ারকন্ডিশনিং, ওয়েল্ডিং, সুইং মেশিং অপারেশনসহ ২৩টি পেশাভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৭ হাজার প্রশিক্ষাণার্থী মেট্রোরেল, আরএফএল, ওয়ালটন এর মত দেশের শীর্ষস্থানীয় দেশ বিদেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার সুযোগ পেয়েছেন। সফল আত্মকর্মী হিসেবে তিনি পেয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

বৈশ্বিক যুব উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'সাউথ এশিয়ান ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' পান মতিউর রহমান বিল্লাল। ২৮ এপ্রিল ২০২৩ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় একটি পাঁচতারকা হোটেলে গ্লোবাল ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নেপাল সংসদের স্পিকার ইন্দিরা রানামাগার তাঁর হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। এর আগে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখায় জাতীয় যুব পুরস্কার পান। ১ নভেম্বর ২০২২ এ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই বছর মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাকে 'ডেইরি আইকন ২০২১' পুরস্কার প্রদান করেন।

মতিউর রহমান বিল্লাল আকাশছোঁয়া স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। তাঁর স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নে মূল ভিত্তি হলো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রম। তিনি বলেন, আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ তরুণ উদ্যোক্তাদের ওপর নির্ভরশীল। তাই তরুণদের দক্ষ করে গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অংশীদার হতে কাজ করে যাচ্ছেন।

সূত্র :

- দৈনিক সমকাল : ০২-১১-২০২২
- আজকের রূপান্তর : ০৫-০৫-২০২৩

একুশে ফেব্রুয়ারি

একুশ আমার অহংকার
মুক্তির চেতনা
একুশ জোগায় সাহস
মাথা নত না করার প্রেরণা।
একুশ মানে বীর বাঙালির
অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি।
একুশ মোদের গৌরব
আবেগ আর ভালোবাসার অনুভূতি।

একুশ হলো ভাষার সাথে,
উদ্যম খুঁজে পাওয়া।
একুশ মানে এগিয়ে যাওয়া
দীপ্ত শপথ নেওয়া।

বাঙালির জীবনে একুশ আসে বারবার
একুশের প্রথম প্রহরে
বিনম্র শ্রদ্ধায়
স্মরণ করি ভাষা শহিদদের।
সারা বিশ্বের কোটি কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হয়
একুশের অমর শোকসংগীত
'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি...।'

শুভ জন্মদিন

সবুজ শ্যামলে ঘেরা গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায়
সতের মার্চ উনিশশত বিশ
জন্ম নিলো–
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খোকা থেকে মিঞা ভাই
বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা
শামসুর রাহমানের 'ধন্য সেই পুরুষ'
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ তাই একই সূত্রে গাঁথা।

ইতিহাসের মহানায়ক
হে ক্ষণজন্মা নেতা
তোমার জন্যই পেয়েছি আজ
লাল সবুজের পতাকা।

তোমার স্বপ্ন 'সোনার বাংলা'
গড়বো মোরা একসাথে
তোমার জন্মদিনের শুভক্ষণে
এ দীপ্ত প্রত্যয় আজ।

স্বাধীনতা

পরাধীনতার শিকল ভেঙে
একাত্তরের ছাব্বিশ মার্চ
বিশ্বের বুকে স্বাধীন অস্তিত্ব
ঘোষণা করেছিল বীর বাঙালি।

শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত অধ্যায়
মৃত্যুপণ লড়াই, রক্ত সমুদ্র পাড়ি
ত্রিশ লাখ শহিদ–
চার লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি!
এতো ত্যাগ, এতো তিতিক্ষা বৃথা যেতে পারে না
বীর বাঙালি ছিনিয়ে আনে
ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন–
'মহান স্বাধীনতা।'

এ অর্জন অহংকারের
এ অর্জন মাথা উঁচু রাখার সুদীপ্ত প্রত্যয়
সবুজের বুকে লাল পতাকা
বাতাসের সাথে হেসে হেসে
যেন সেই কথাই বলে।

স্বাধীনতা বেঁচে থাকুক
বাঙালির অন্তরময় হয়ে
ছোট্ট শিশুর স্নিগ্ধ হাসির মতো
কাল থেকে কালান্তরে–

এলো খুশির ঈদ

সিয়াম সাধনার মাস শেষে
এলো খুশির ঈদ।
দু'চোখে নাই নিদ
হৃদয়ে তাই উঠলো গেয়ে
'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এলো খুশির ঈদ,
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে,
শোন আসমানী তাগিদ।'

আয়রে আমার 'মম' 'সম'
পরবি নতুন সাজ।
বাহারি রঙের সাজ-পোশাকে
সাজবে সবাই আজ।
খুশির জোয়ারে ভাসছে তারা
যাচ্ছে ঈদগাহে।

ঈদগাহেতে নামায শেষে
সকল বিভেদ ব্যথা ভুলে
ছোট-বড়, ধনী-গরিব
করছে কোলাকুলি।

ঈদের দিনে কারো ঘরে
থাকবে না আর দুখ
সমাজ হোক ভেদাভেদহীন
ছড়িয়ে পড়ুক সুখ।

স্মার্ট বাংলাদেশ

অর্থনীতিবিদ অস্টিন রবিনসনের ভাবনায়
"দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুতে টিকবেনা বাংলাদেশ"
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারতো বাংলাদেশকে
"Bottomless Basket" বলতে দ্বিধাই করলেননা।

কিন্তু,
স্বাপ্নিক বঙ্গবন্ধু ছিলেন অবিচল ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব
তিনি স্বপ্ন দেখতেন,
এদেশ হবে উন্নত ও আধুনিক রাষ্ট্র
এবং যা হবে "স্বপ্নের সোনার বাংলা"
তাই,
বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে নিয়েছেন নানান পরিকল্পনা
কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ
সকল খাতে পরিকল্পিত উদ্যোগ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে
শুরু হয় তাঁর অদম্য পথচলা।

তারই ধারাবাহিকতায়
সেই বঙ্গবন্ধুরই কন্যা শেখ হাসিনা
আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে
এদেশকে করেছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ।
এখন,
জনগণ গ্রামে বসেই পাচ্ছেন শহরের সুবিধা।
নিজের টাকায় পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল আর কর্ণফুলী ট্যানেল
আমাদের আত্মবিশ্বাসকে করেছেন দৃঢ়তর।
'বাংলাদেশ উন্নয়নে বিশ্বে এখন রোল মডেল।'

এবার আরও এগিয়ে যাওয়ার পথে
আমরা হতে চাই,
একটি স্মার্ট বাংলাদেশের নাগরিক।
তাইতো,
বঙ্গবন্ধুর কন্যার প্রবল আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা
'গন্তব্য এখন দুই হাজার একচল্লিশ
চার মূল ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ
স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি।
আমরা পাবো,
"সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী বাংলাদেশ।"

"আমরা এগিয়ে যাবো, এ আমাদের বিশ্বাস।
বিশ্বের বুকে মাথা করিব উঁচু, ছাড়িব মুক্তির নিশ্বাস।"

বই পড়ি

পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি
আর মোবাইলে আসক্তি
তরুণ-যুব-কিশোরেরা
হচ্ছে আজ বিপথগামী।

ধর্মান্ধতার বাড়াবাড়ি,
কুসংস্কার আর নানামাত্রিক ভন্ডামি
সমাজব্যবস্থায় শিকড় গেড়ে আছে বহুদূর।
থামছেনা হানাহানি
ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাকার
হচ্ছে জগৎসংসার।

মাদকের কড়াল গ্রাসে
স্বপ্ন হচ্ছে বিনাশ
সামাজিক অবক্ষয়ে
অস্থির সমাজ ও পরিবার।

উত্তরণের পথ খুঁজতে
সকলেই খাচ্ছে হিমসিম।
কে দিবে এর সমাধান?
মনীষীরা বলেন,
'এসো ভালো বই পড়ি,
নেশামুক্ত জীবন গড়তে
বইয়ে রই মত্ত।
সাদা কাগজের কালো লেখা
দিতে পারে সমাধান!
ইহকাল আর পরকালে
পাবে সঠিক পথের সন্ধান।'

অভিমানের বাঁধন টুটে

অভিমান ভাঙবো কেমন করে!
তার উত্তর পাইনি খুঁজে
ব্যথার আঁকড়ে ডুবে থাকা কষ্টগুলো
পরম যতনে রেখে যাও আড়াল করে
শত চেষ্টায়ও তা বুঝতে দাওনা আমায়
কি এমন অভিমান যা শুধু তোমার?

ফিরে আসবে ভেবে
পথের দিশায় দৃষ্টি ফেলে রাখি
সকালের সূর্য বিকেল গড়িয়ে বিলীন হয়ে যায়
চারিদিকে নামে আঁধার–
পাখিরাও নীড়ে ফিরে যায়–
মেঘভাঙা আকাশে চাঁদের লুকোচুরির খেলায়
মনে পড়ে বার বার শুধু তোমায়।
তবু কেন ফেরা হয়না তোমার?

ফিরে এসো, ফিরে এসো অভিমানের বাঁধন টুটে
নিঃসঙ্গতায় সঙ্গ হতে
এবং ভালোবাসো শুধু আমাকে,
এ সত্য আজ জেনে যাক সমস্ত বিশ্ব
তুমি কেবলই আমার...

বৈশাখ

কাল বৈশাখী ঝড়ে
বৎসরের জমে থাকা আবর্জনা
নিমিষেই চলে যাক দূরে।

দূর হয়ে যাক হৃদয়ের যতো গ্লানি যন্ত্রণা
মমতার পরশে ঘুচে যাক সব দূরত্ব
ভালোবাসায় আবর্তিত হোক সকল ভাবনা।

মহাকালের চিরায়ত প্রথায় বৈশাখ আসে
বাঙালির প্রাণের উৎসব হয়ে।
গাঁয়ের পথে প্রান্তরের রঙিন মেলায়
কিশোর-তরুণেরা প্রাণের স্পন্দনে
বৈশাখী সাজে পুলকিত জনে জনে।

বৈশাখ মানেই চিরায়ত বাঙালি,
পান্তা ভাত আর ইলিশ ভাজা
একরাশ হতাশা আর ব্যর্থতার
পাহাড় ডিঙিয়ে গ্রাম থেকে শহরের অলিগলি
প্রতিটি আনাচে-কানাচে
প্রাণের জোয়ার জাগে বাঙালির জীবনে।

বৈশাখের দিনগুলোতে
নদী তীরের কথা
সেই বটতলার কথা,
আজও মনে পড়ে যায়।

প্রাণের নির্মল উচ্ছ্বাসটুকু ছড়িয়ে
কানে বাজে আজও সেই বাঁশির সুর,
বুকের ভিতর মিথেল এক অনুভবে
নববর্ষের উদ্দীপনায়
এখনো আমাদের টেনে নিয়ে যায়।
তাই মুখরিত হই, আলোড়িত হই,
আবেগের হিল্লোলে।
বৈশাখ বেঁচে থাকুক বাঙালির প্রতিটি প্রাণে।

দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন

সময় বদলে গেছে,
হারিয়ে যাচ্ছে মনুষ্যত্ববোধ
আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ
নিয়েছে বিদায়,
মহামারী চলছে শালীনতার ও নৈতিক অধঃপতনের!
চারদিকে অবক্ষয় আর নিরাশার প্রতিধ্বনি।

কিন্তু কেন?
দিন এসেছে মুক্তির প্রত্যাশায়,
ঘুণে ধরা সমাজের পরিবর্তন চায়।

পৃথিবীটাকে বদলাতে চাই
নিজেকে বদলাতে চাই না
এ মনোভিত্তি পরিহার সবার আগে।
পৃথিবী বদলাতে হলে
বদলাতে হবে দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিজীবন
তবেই না ফলপ্রসূ হবে,
সমাজ কিংবা পৃথিবী বদলানোর সংগ্রাম।

নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ

গ্রামের এক নিভৃত পল্লিতে
জ্বালিয়েছে আলোর মশাল
দাঁড়িয়ে আছে স্ব-মহিমায়
আবেগ আর বহু প্রতীক্ষিত
গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ।

শ্যামলিমায় ঘেরা নয়নাভিরাম ক্যাম্পাস
আর সবুজ ঘাসে ভরা বিশাল মাঠ
প্রতিদিন মুখরিত হয়
হাজারও মেধাবী শিক্ষার্থীর পদচারণায়।

একাডেমিক শিক্ষাই নয়
জ্ঞানচর্চা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে
নিজেদের সক্ষমতা
প্রতিনিয়ত জানান দিয়ে যায়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মৈত্রী-বন্ধন
দৃষ্টান্ত আজ সকলের কাছে।
শিক্ষার্থীদের সৌজন্যবোধ
উচ্চারিত হয় জনে জনে
কলেজের অতিথিপরায়ণতা
ছড়িয়ে পড়েছে লোক থেকে লোকান্তরে।

তাই, সবুজে সবুজে ঘেরা ক্যাম্পাসে
বারংবার হাজির হতে মন চায়
কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে
আবার আসিব ফিরে,
ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়...'

কেমন আছো?

মোবাইল ফোনের মেসেঞ্জারে ভেসে আসলো একটি SMS-
কেমন আছো?
বহুবার এ শব্দটির মুখোমুখি হলেও
ওই দিনকার অনুভূতিটা একটু ভিন্নই ছিল
হৃদয়টা আচমকা নাড়া দিয়ে ওঠে
ফেসবুক আইডিটাও কেমন যেন অচেনা লাগছে
তবুও কোথায় যেন একটু চেনা চেনা মনে হচ্ছে।
যাই হোক খুব বেশি ঘাটাঘাটি করতে হয়নি
অল্পতেই আবিষ্কার করলাম
এ যে আমার বহুদিনের প্রত্যাশিত ব্যক্তি
কবিতা, এ তুমি ছাড়া অন্য কেউ নয়

সময়ের পরিক্রমায় কেটে গেছে অনেকটা সময়
জানতে চেয়েছো...
এ আমি কেমন আছি?
প্রশ্নটা নিতান্তই সহজ কিন্তু উত্তরটা আনুভূতিক
বার বার নিজেকে প্রশ্ন করি
আসলে আমি কেমন আছি?

"ভোরের আলোক ফোটার মুহূর্তে যখন ঘুম ভাঙে
পুব আকাশে উঁকি দেয় সূর্য
হৃদয়ের গহিন থেকে তখন ভেসে আসে
তুমিহীন একরাশ হাহাকার"
কবিতা, এখন তুমিই বলো...
আমি কেমন আছি?
আমারও যে জানতে ইচ্ছে করে
প্রতিক্ষণে-প্রতিমুহূর্তে নিঃসঙ্গতায় একান্তক্ষণে
ভালো আছো তো?
তুমি ভালো আছো তো?

স্বপ্নিল বিভোরতা

চলেই যদি যাবে
তবে কেন এতো অভিমান?
সহজেই বলতে পারতে
তুমি আমার নও!

ঘুমভাঙা নিশীথে কিংবা গোধূলী সন্ধ্যায়
নীড়ে ফেরা পাখিদের কুজনে,
রাতের চন্দ্রালোকের মৌনতায়
আলো আঁধারের লুকোচুরিতে
এখনও মনে দোলা দেয়
মনে পড়ে তোমাকে।

নদীর তীরের সবুজ ঘাসের কার্পেটে বসে
চোখে চোখ হাতে হাত রেখে বলেছিলে
আমি নাকি শুধুই তোমার,
অন্য কারো নই!
এই যে প্রত্যাশা,
এই যে স্বপ্নিল বিভোরতা
এ সবই কি তবে ছিল মিছে অভিনয়?
আপন ভেবে মনে ধরেছি যাকে
সে তবে আমার নয়?

ভালোবেসে কাছে নিলে
আবার বিশ্বাস ভেঙে ছুড়ে দিলে!
একবারও ভাবতে পারলেনা
এত কষ্ট যন্ত্রণা
সইবার ক্ষমতা আমার আছে কী?

একটু ঘুমাতে চাই!

দীপ নেভা রাতের অন্ধকার
আর পাখির কিচির মিচির কুজনে
মাঝ রাতের নিরবতা ভাঙে
খানিক তখন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই
আলসে ঢংয়ে কথা বলি দূরের ছায়া পথে।
এমনি করে কতকাল ভেঙে গেছে ঘুম।

জানিনা নিদ্রাদেবীর কেন এমন নিষ্ঠুর আচরণ?
স্বপ্নপরীরাও আমায় নিচ্ছে না ডেকে
তাদের ঘুমের রাজ্যে।
নিশীতের কাজল কালো আঁধার
অজানা এক আতঙ্ক
ভর করছে প্রতিনিয়ত
চোখের জল গড়িয়ে আবার শুকিয়ে যাচ্ছে
কাঁদতে ইচ্ছে করছে,
কিন্তু পারছিনা।
পারছিনা নিজেকে সামলাতে
ঘুমোতে চাই...
আমি একটু ঘুমাতে চাই
শান্তির ঘুম!

নির্ঘুম রাতে নিঃসঙ্গতা
বার বার পেছনে টেনে নিয়ে যায়
দেখছিনা এর কোনো মুক্তির উপায়
ওগো নিরঁজন
তোমার কাছে আমি
আজ হয়েছি শরণাপণ।

স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখতে মানা নেই
দেখতেও ভালোবাসে সবাই
স্বপ্ন যে আমার আকাশছোঁয়া
পারবো কি পূরণ করতে?
চেষ্টা করতে দোষ কি তাতে?

স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে
যেন অক্সিজেন দিয়ে
হতাশাকে দূরে ঠেলে
আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বপ্ন যে আমার আকাশছোঁয়া
স্বপ্নে গড়ি রাজ প্রাসাদ,
আমার ঘর আমার সংসার
হাজারো স্বপ্ন নিয়ে বসবাস
এ স্বপ্ন কখন সত্যি হবে?
বল, কে তা জানে?

অনুভবে একান্তে নিরজনে
স্বপ্নেই থাকি সুজনে কুজনে
তাইতো কবির দৃঢ়তা–
'যদি লক্ষ্য থাকে অটুট
বিশ্বাস হৃদয়ে হৃদয়ে
হবেই হবে দেখা
দেখা হবে বিজয়ে।'

ক্ষমা কর প্রভু

চলতে চলতে একদিন
থেমে যাবে প্রাণ পাখি
মায়াজালের বাঁধন টুটে
হারিয়ে যাব দূর অজানায়
কোথায় তার ঠিকানা
কার বা আছে জানা?
একে একে ভুলবে সবাই
এ কথাই যেন সত্য।

তবে কিসের অহংকার
কিসের এতো বড়াই?
সবকিছুই তো আজ মিছে
নির্মম সত্য এটাই যে ভাই।

জীবন সায়াহ্নে হিসাব মেলা ভার
হে প্রভু, ওগো দয়াময়
ক্ষমা কর আজ
পার কর আমায়।

অভিমান

জীবনে কতো কথাই না থাকে। তারই মধ্যে কিছু কথা আছে ভুলাও যায় না আবার বলাও যায় না। মনের আঙিনায় সুযোগ পেলেই যেন উঁকি দিয়ে যায়। প্রায় দেড় যুগ আগের কথা, তখনও ল্যাপটপ সহজলভ্য ছিলো না। তিশা এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় তার মা তাকে একটি ল্যাপটপ কিনে দেয়। ল্যাপটপ পেয়ে খুশিতে প্রিয়জনদের মতো দীপকেও এ খবর জানাতে ভুলেনি তিশা।

তিশা দীপকে ফোনে বলে, 'আমাকে দাওয়াত দিলে ল্যাপটপ নিয়ে আপনার এখানে বেড়াতে আসবো।'

দীপ জানায়, 'ঠিক আছে অফিসের ব্যস্ততা কমলে তোমাকে আসতে বলবো। তখন তুমি এসো।'

এরপর কেটে গেছে বেশ কয়েক বছর।

হঠাৎ একদিন তিশার নতুন ল্যাপটপে একটি ডকুমেন্টারি দেখানোর জন্য অফিসে আমন্ত্রণ জানায় দীপ। আমন্ত্রণ পেয়ে এক মুহূর্তও দেরি করেনি তিশা। মনে হয়েছিল দীপের ডাকের জন্যই যেন অপেক্ষায় ছিল সে।

দিনটি ছিলো সোমবার। তিশা যথাসময়ে দীপের অফিসে উপস্থিত হয়। দীপের কলিগরা তিশাকে দেখে একটু উৎসুকসূচক আগ্রহ নিয়ে পরস্পরকে ইঙ্গিত করতে থাকে। বিষয়টি তিশার চোখে ধরা পড়লেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলো না।

তিশা তার পরিবারের তিন বোনের মধ্যে মেঝো। দেখতে শ্যামল বরণ হলেও তার কথাবার্তায় যেমন স্মার্টনেস পড়াশোনায়ও অত্যন্ত মেধাবী।

অপরদিকে দীপ চার ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট। সে বেসরকারি একটি কোম্পানিতে মার্কেটিংয়ে চাকরি করতো। বসের সাথে বনিবনা না হওয়াতে চাকরি ছেড়ে দেয়। এখন সে প্রায় বেকার জীবনযাপন করছে। জমানো

টাকা শেষ হতে চলল। আগামী দিনগুলো কিভাবে কাটবে এ ভাবনায় তার জীবন অস্থির। ইতোমধ্যে নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে অতিথি শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করার জন্য অফার আসে। বেতন কম হলেও হাত খরচ চালানোর জন্য শিক্ষকতার এক নতুন অভিজ্ঞতা শুরু হয় তার। দীপের ক্লাস নেয়ার ধরণ অল্প সময়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। শিক্ষকতা শুরু করার মাস খানেকের মধ্যে একটি টিউশনির অফার আসে। একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে পড়াতে হবে। ফেমিলিটি বেশ স্বচ্ছল। তাই কলেজ সময় পার হওয়ার পর হাতে বেশ সময় থাকায় টিউশনি করতে রাজি হয় দীপ।

প্রথম দিন পড়াতে গিয়ে দীপের বুঝতে বাকি রইলোনা যে তার ছাত্রীটি যথেষ্ট মেধাবী। দীপ তাকে ইন্টারমিডিয়েটের ফাইনাল পর্যন্ত বছর দুয়েক বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়িয়েছে। তার মেধার তারিফ সবসময় সহকর্মীদের শোনাতো। অতি অল্প সময়েই তার যেকোনো বিষয় দ্রুত আয়ত্ব হতো, তা দেখে শ্রেণি শিক্ষকরা তিশার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব আশাবাদী। তাকে ঠিকমত পরিচর্যা করলে একদিন সে অনেক ভালো কিছু করে দেখাতে সক্ষম হবে। কলেজে শিক্ষকতা করা অবস্থায় ভালো বেতনের একটি চাকরি হয়ে যায় দীপের। চাকরি পাওয়ার পর দীপ গ্রামের বাড়ি সৈয়দপুর থেকে রংপুর শহরে চলে আসে। তিশার সাথে দেখা হয় না অনেক দিন।

দীপের আমন্ত্রণে তিশা এই প্রথম তার অফিসে এসেছে। অনেক দিন পর দেখা হওয়াতে তিশা অস্থিরমুক্ত কিছুটা ভাবপ্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও তা অন্যদের চোখে তেমন পড়েনি। ডকুমেন্টারি প্রদর্শন শেষে দীপ ও তার কলিগদের সাথে তিশাও লাঞ্চ করে। পরে সবার কাছ থেকে বিদায় নেয় তিশা।

মেয়েটি কে?

দীপের সহকর্মী লাবণ্য জিজ্ঞেস করে।

– মেয়েটির নাম তিশা। পুরো নাম নাঈমা রহমান তিশা। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে।

'দেখতে অত্যন্ত চমৎকার। কথাবার্তা আচার আচরণ আমাদের মুগ্ধ করেছে'

লাবণ্যের এ কথার সাথে অন্য সহকর্মীরাও সুর মেলাচ্ছে।

কিন্তু সহকর্মীদের মুখে তিশার এত প্রশংসা শুনে কেমন যেন সন্দেহ লাগছে দীপের।

'আপনারা তিশার এত প্রশংসা করার মানে জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করে দীপ।

দীপের প্রশ্নের প্রতিত্তরে লাবণ্য বলে–

– অভয় দিলে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই?

বলেন, কি বলতে চান?

আপনি বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজছেন। আমাদের মনে হয় তিশার চেয়ে পারফেক্ট মেয়ে হয়না। তিশার চাহনিতে বুঝার চেষ্টা করেছি, তিশা আপনাকে অনেক পছন্দ করে। লাবণ্যের কাছ থেকে এ কথা গুনে অবাক হয়ে যায় দীপ। সে বেশ কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে বসে থাকে। কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেনা। তিশাকে বিয়ে, এ যেন কখনও কল্পনাতেও আসেনি দীপের।

লাবণ্যের সাথে অন্য কলিগরাও বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য তার উপর এক প্রকার চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

'আপনি না পারলে সবার পক্ষ থেকে আমি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাব' লাবণ্য'র জোরালো আবদার।

একথা শোনার পর দীপ তার অফিস রুমে চলে যায়। রুমের দরজা বন্ধ করে একান্তেই ভাবতে থাকে। ঘণ্টা খানেক পর রুম থেকে বেরিয়ে কলিগদের সাথে বসে।

লাবণ্যর একটাই কথা, 'আমিই তিশাকে বিয়ের প্রস্তাব দিব। আপনি না করতে পারবেন না।'

– 'না আপনার দিতে হবেনা, আমি নিজেই তাকে প্রস্তাব দিব' একথা লাবণ্যকে জানায় দীপ।

তিশা এবং দীপ দু'জনেই পাশাপাশি গ্রামের। দু'জনের বাড়ি যাওয়ার রাস্তাও এক। রংপুর শহর থেকে তাদের গ্রামের বাড়ির পাশে সৈয়দপুর বাসস্ট্যান্ডের দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার।

তিশাকে ফোন করে দীপ। 'তুমি বাড়ি যাওয়ার সময় আমাকে সাথে নিয়ে যেও, জরুরি কিছু কথা বলার আছে।'

তিশা তার কথায় সায় দেয়।

শুক্রবার বন্ধ থাকায় প্রতি বৃহস্পতিবার দু'জনেই গ্রামের বাড়িতে যায়। শনিবার সকালে রংপুরে ফিরে আসে। বৃহস্পতিবার অফিস ছুটির পর বিকেল সাড়ে চারটার দিকে অফিসের গেইট থেকে রিকসায় ওঠে দীপ।

রিকসাওয়ালা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাবেন স্যার?'

দীপ: বাসস্ট্যান্ডে যাও ভাই।

রিকসায় বসে তিশার কথা ভাবছে দীপ। কিভাবে বিয়ের প্রস্তাবটি তিশাকে দিবে। বললেই বিষয়টি কিভাবে নেবে। এ কথা চিন্তা করতে করতে বাসস্ট্যান্ডে চলে আসে দীপ। রিকসা থেকে নেমে দু'জনের জন্য বাসের টিকিট কেটে তিশার জন্য অপেক্ষা করে দীপ। এর মিনিট দশেকের মধ্যে তিশা রিকসা থেকে নেমে দীপের কাছে চলে আসে।

বাসে উঠে পাশাপাশি সিটে বসে দু'জনে। বাস গন্তব্যের উদ্দেশ্যে স্ট্যান্ড ছেড়ে চলতে থাকে।

বাসের ঝাকুনি দীপের মনের ভিতর যেন কাঁপন ধরাচ্ছে। বিয়ের বিষয়টি কিভাবে বলবে তা ভেবে পাচ্ছেনা দীপ, এক ধরনের অস্থিরতায় শরীর থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছে। এদিকে তিশা বার বার তাকে জিজ্ঞেস করছে 'আপনার কি জানি জরুরি কথা আছে? বলেন–

এরই মধ্যে সহকর্মী লাবণ্য দীপের মোবাইলে ফোন করে, জানতে চায়।

'স্যার আপনি কি তিশাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন?'

দীপ : 'না বলিনি, ...এখনই বলবো।'

আধা ঘণ্টা বাস চলার পর এক পর্যায়ে দীপ তিশাকে জানায়, 'আমার সহকর্মীরা তোমাকে বেশ পছন্দ করেছে। তারা তোমার সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছে। তুমি যদি এ প্রস্তাবে রাজি থাক তাহলে বিষয়টি সামনে নিয়ে যাব। আপত্তি থাকলে এখানেই শেষ, আমাকে ভুল বুঝনা।'

পরের বার দম নেয়ার আগেই কথাগুলো একটানে...তিশাকে বলে শেষ করে দীপ।

এ কথা শোনার পর তিশা একেবারে চুপছে যায়। মিনিটি দশেক পর তিশা বলে, 'আমি এ প্রস্তাবে রাজি। তবে সবকিছু নির্ভর করছে আম্মার ওপর। আম্মা যদি রাজি হয়ে যায় তাহলে পরিবারের আর কারও সম্মতি লাগবেনা।'

তোমার আম্মাকে কে বলবে? জিজ্ঞেস করে দীপ।

'আম্মাকে আমিই বলবো। আশা করি তিনি এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবেন না'। এর কিছুক্ষণ পর বাস এসে থামে সৈয়দপুর বাসস্ট্যান্ডে। বাস থেকে নেমে দু'জনেই যে যার মত বাড়ি চলে যায়।

এরপর কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে যায়। তিশার কোনো যোগাযোগ নেই। মাস খানেক পর ফোন করে দীপ। তিশার কাছ থেকে তার আম্মার সম্মতির বিষয়টি জানতে চায়। পরে জানাবো বলে তিশা বিষয়টি এড়িয়ে যায়। কয়েকদির পর সহকর্মী লাবণ্য দীপের কাছ থেকে তিশার মোবাইল নাম্বার নেয়। তিশার মোবাইলে কল করে লাবণ্য। ফোনে তিশা লাবণ্যকে জানায় তার আম্মা এ বিয়েতে সম্মতি এখনও দেয়নি।

লাবণ্য'র কাছ থেকে এ কথা শুনে পিছু হটে দীপ। তিশার সাথে বিয়ের বিষয়টি নিয়ে দীপ আর ভাবতে রাজি নয়। তিশার প্রসঙ্গ তুলতে কলিগদেরও সে নিষেধ করে। তবে এ ঘটনার পর তিশার মায়ের অসম্মতির বিষয়টি মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে দীপের। কিন্তু তার ভেতরের চাপা কষ্ট কলিগদের বুঝতে দেয়নি। বরং কলিগদের কাজে মন দেয়ার তাগিদ দিয়ে নিজে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। এরপর তিশার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় দীপের।

বছর খানের পর দীপ তার মা-বাবার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করে। বেশ সুন্দরভাবে দীপের দাম্পত্য জীবন কাটছে। দেখতে দেখতে কেটে গেছে দশ বছর। তিশার সাথে যোগাযোগ নেই।

দীর্ঘ সময়ের পর তিশার এক বান্ধবীর কাছ থেকে দীপ জানতে পারে তিশা একটি বেসরকারি ফার্মে ভালো পোস্টে চাকরি করে। এর মধ্যে তিশার বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। এর কয়েক বছর পর ছোট বোনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বেশ সুখেই জীবন-যাপন করছে। কিন্তু তিশার এখনও বিয়ে হয়নি।

কিন্তু দীপের কাছে বিষয়টি অনেকটাই অস্বাভাবিক মনে হয়। তিশা নিজেকে কেন এভাবে লুকিয়ে রেখেছে। তার কলেজ পড়ুয়া বান্ধবী সকলেই ঘরসংসার ও ছেলে মেয়ে নিয়ে বেশ ভালোই জীবন কাটাচ্ছে।

তিশার ক্ষেত্রে এমন হওয়ার তো কথা নয়। একজন মেধাবী স্মার্ট মেয়ে কি কারণে বিয়ের পিড়িতে বসছেনা। সে কি তাহলে কোনো ক্ষোভের কারণে বিয়ে করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নানা প্রশ্ন দীপকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। এ ভাবনায় দীপ রাতে ঘুমাতেও পাচ্ছেনা।

'আমার সাথে তিশার তো প্রেমঘটিত কোনো ব্যাপার ছিলো না তবে কেনইবা এমনটা হলো। আমাকে যদি সে একবারও বলতো, 'আমার জন্য অপেক্ষা করবে, তাহলে না হয় অপেক্ষা করতাম। একথাও তিশা কোনোদিন আমাকে বলেনি। তাহলে কিসের এত অভিমান' – দীপকে এ কথাগুলো ভাবনায় ফেলে দেয়।

এদিকে তিশার এক কাজিনের নিকট দীপ জানতে পারে যে, দীপের সাথে বিয়ে দিতে রাজি না হওয়াতেই অনেকটা ক্ষোভ নিয়ে বিয়ে করতে ধীরে ধীরে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে তিশা। এ খবরটি জানার পর দীপ বুকের ভেতর নিদারুন কষ্ট অনুভব করে। বার বার তিশার স্মৃতিগুলো তার চোখের সামনে ভেসে আসতে থাকে।

রাতের নিস্তব্ধতায় নিজের অজান্তেই তিশাকে যতবারই মনে পড়ছে, দীপ ততবারই নিজের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে...

অভিমান ভাঙবো কেমন করে!
তার উত্তর পাইনি খুঁজে
ব্যথার আঁকড়ে ডুবে থাকা কষ্টগুলো
পরম যতনে রেখে যাও আড়াল করে
শত চেষ্টায়ও তা বুঝতে দাওনা আমায়
কি এমন অভিমান যা শুধু তোমার?